২৬১

সাক্ষরতা বুলেটিন

ফাল্গুন ১৪২২
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৬১ ফাল্গুন ১৪২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সূ চি প ত্র

৩ **শফি আহমেদ**
মাতৃভাষার লালন ও ক্ষমতার আন্তঃসম্পর্ক

৬ **ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম**
উপনিবেশিক শাসনামলে বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চা

৯ **শাওয়াল খান**
একুশ: টেকসই সাক্ষরতা দক্ষতা ও টেকসই উন্নয়ন

১৪ **কুমার প্রীতীশ বল**
মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা

১৯ **রতন সরকার**
শিক্ষার মাধ্যম: প্রয়োজন যুগোপযোগী বিশ্লেষণ

২১ **এ কে শেরাম**
আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম : আমাদের করণীয়

২৫ **বিশেষ প্রতিবেদন:** একুশে শিক্ষা মেলা

২৬ **বিশেষ প্রতিবেদন:** *অভিযান*-এর কৌশলগত পরিকল্পনা

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

শ ফি আ হ মে দ

মাতৃভাষার লালন ও ক্ষমতার আন্তঃসম্পর্ক

একুশে ফেব্রুয়ারি যে আমাদের জাতীয় জীবনের বহুমুখী শক্তির উৎসবিন্দু, একথা এখন 'বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত'-এর মতই শিরোধার্য ও বিতর্কাতীত বিষয়। যদিও পাদটীকার আকারে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েই থাকে, সেগুলি নানা চরিত্রের, অনেক ক্ষেত্রেই অমীমাংসিত এবং কখনো কখনো কয়েকটির প্রতি নিরুত্তর পরাজিত দৃষ্টিতে তাকাতেও হয়।

আবার কয়েকটি বিষয় নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা, বিশেষ করে এই কিঞ্চিত খর্বআয়ু ফেব্রুয়ারিতে, আমাদের দেশের বুদ্ধিজৈবিক বৃত্তকে বেশ একটু মুখর করে তোলে। এমনকি সামরিক শাসনামলে যখন সরকারি ফরমান বাস্তবায়ন করার জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘনকেও প্রায় ন্যায্যতা দেয়া হয়, সেরকম সময়েও সরকারি যোগাযোগের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য প্রদত্ত আদেশ যে পালন করা হল না, সেজন্য কাউকে কোন জবাবদিহিতার দায় বইতে হয়নি।

এই ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, একুশের চৌষট্টি বছর পেরিয়ে, যে উচ্চ আদালত পবিত্র সংবিধানের রক্ষক বলে বিদিত, সেখানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ব্যবহারের অতীব রক্ষণশীল রীতি বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন অনেকে। বিচারালয় থেকে কিছু নিচু স্তরের অজুহাতনামা পেশ করা হয়েছে। বাংলা একাডেমির মত প্রতিষ্ঠান দেশে বাংলা ভাষার প্রাধান্যকে বিপুলভাবে তুলে ধরতে পারেনি। ক্ষমতার রদবদলের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তনই রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যাক না কেন, নানা যুক্তির অনুশীলনে বাংলা ভাষার ব্যাপকতর গ্রাহ্যতাকে ক্ষুণ্ন করার প্রয়াসসমূহ অব্যাহত থেকে গেছে বিভিন্ন সরকারের আমলে।

ভাষা আন্দোলনের তাপ-উত্তাপে বাঙালি যখন উত্তেজিত ও স্বেদসিক্ত, তখন বাংলাকে অন্য হরফে লিখনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সারা জাতি প্রবলভাবে ফুঁসে উঠেছিল। আর এখন ভাবতে আর অবাক লাগে না, কিশোর-কিশোরী থেকে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া সবাই তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্ষীণতনু সব বার্তা পাঠাচ্ছে, বাংলা শব্দ ইংরেজি হরফে লিখে। এইসব মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো একুশের নানা অনুষ্ঠানে নিজেদের প্রচার ও বিপণন বিস্তারে বেশ ভাল অঙ্কের বিনিয়োগ করছে বিজ্ঞাপন ও পৃষ্ঠপোষকতায়, কিন্তু সেই তারাও সারাদিনই ইংরেজি হরফে বাংলা ভাষার শব্দ লিখে গ্রাহকদের কাছে নানা মনোহারী বার্তা পাঠাচ্ছে। বাংলা একাডেমিকে আমি এবং আমার মত লাখো মানুষ নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করি, আশ্রয় বলে ভাবি। কিন্তু এই কথাটা লিখিতভাবে পেশ করে রাখা দরকার যে, বেশ কয়েক মাস বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের বরাতে মোবাইল ফোনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে, যার শব্দসমষ্টি বাংলা ভাষার, আর হরফ ইংরেজি। একসময় যে বোধোদয় হয়েছে, এমন ধরনের শ্রীহীন বার্তা প্রেরণ বন্ধ হয়েছে, বিলম্বে হলেও সেটা একটা বিধেয় পদক্ষেপ। উল্লেখ্য, যখন এটার প্রথম প্রচলন ঘটেছিল তার আগেই প্রায় সব ফোন সেটে বাংলা লিপি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারও বেশ আগে এ বিষয়ে একটা বাধ্যতামূলক নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

জীবনের সায়হ্নবেলায় পা দেয়া আমার মত বয়সীদের অনেকের স্মৃতিতে বিগত কয়েক দশক আগের বিশে ফেব্রুয়ারির বিকেলের

একটা পরিচিত বিষয় মনে পড়বে। এমনকি আশির দশকের প্রথম এক বা দুই বছরও এমন দৃশ্যটা উপভোগ করেছি বলে মনে পড়ে। ঢাকায় এবং সারাদেশে বাংলা প্রচলনের একটা বড় নিদর্শন বা প্রচারণা ছিল বিভিন্ন বিপনি বিতান বা দোকানের নামে। চমৎকার সব নাম দেয়া হত। মনে আছে, এলিফ্যান্ট রোডের মোড়ে একটা দোকানের নাম ছিল 'সাগর থেকে ফেরা'; প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটা কবিতাগ্রন্থের নাম। এই সূত্রেই মনে পড়ে গেল, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পরই আমাদের জাতীয়তাবাদ প্রকাশে বাংলা ভাষার প্রতি আবেগের আতিশয্য এমনই ছিল যে, অনেকেই তখন এলিফ্যান্ট রোডের বদলে সাইন-বোর্ডে বা সংস্থার নামযুক্ত প্যাডের কাগজে বা ব্যক্তিগত কার্ডে 'হাতী সড়ক' লিখতেন।

যাক, যে টুকরো স্মৃতি রোমন্থন করতে চাইছি তা হল, তখন, মানে আশির দশক পর্যন্ত দোকানের নামে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার তেমন একটা ছিল না, আর তা সত্ত্বেও যারা নিজেদের বাড়তি চটপটে বা একটু বেশি আধুনিক বলে জাহির করার চেষ্টা করতেন ইংরেজি শব্দের প্রয়োগে, তারাও বিশে ফেব্রুয়ারির বিকেল বেলা থেকে কালো কাপড় দিয়ে ওইসব দোকান বা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাইনবোর্ড ঢেকে দিতেন, কিছুটা লজ্জায় এবং অনেকটা ভয়ে। বোঝাতে চাইছি, ভাষার সঙ্গে আমাদের জাতীয়তাবাদী প্রেরণা কতটা গভীর ছিল। দোকান বা প্রতিষ্ঠানের নামে বাংলাকে ধীরে ধীরে দুয়োরানীর ঘরের দিকে নির্বাসনের যে ধারা, তার সঙ্গে এদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের বিশেষ যোগ ছিল।

আমার মত বয়সীদের আরও মনে পড়বে, ওই ষাটের দশকের দ্বিতীয় অর্ধে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার দাবি জাতীয়ভাবে সারা বাংলাদেশের প্রশ্নাতীত শ্লোগানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, শেখ সাহেবও বুঝতে পারছিলেন যে, ছয় দফা মানুষকে স্বাধীনতার ধারাস্রোতের দিকে সবেগে বাহিত করছে, এই জোয়ারের টানে তাকে দক্ষ কাণ্ডারীর ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করতে হবে। ওই সময়ের একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারের দিকে চলমান মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতে যেসব প্ল্যাকার্ড বা ব্যানার থাকতো, সেখানে এটাই বোঝানো হত যে, ভাষার অধিকার আমরা ছিনিয়ে এনেছি, এখন গন্তব্য স্বাধীনতা।

ভাষা আন্দোলনের উত্তাপ ও সাফল্যই আমাদের গতিপথকে চিনিয়ে দিয়েছে। ওই আন্দোলন, যা ক্রমেই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের গতিপথে পরিণত হয়ে উঠছে, তখন ভাষা ও স্বাধিকারের অঙ্গাঙ্গী যোগের কথা উচ্চারিত হত জোরেসোরেই। প্রায় সব বিদ্যালয়েই বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। ক্যাডেট কলেজগুলোকে সংস্কার করা বা বন্ধ করে দেবার কথা উঠতো। বাঙালি মধ্যবিত্ত প্রবলভাবে বাংলা মাধ্যমে স্কুলশিক্ষার পক্ষপাতী ছিল। খোদ ঢাকাতেও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টকর ছিল দেশ স্বাধীন হবার পর সত্তর দশকের প্রথম অর্ধে। এই পরিস্থিতি যে পরিবর্তিত হতে থাকল, ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় যে বাড়তে বাড়তে এখন রাজধানী থেকে দেশের সব ইউনিয়নের কেন্দ্রে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, এমন প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালা-বদলের যোগ আছে।

আবেগের আতিশয্যের বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিছুটা প্রত্যাশিতই ছিল। গাড়ির নম্বরফলক বাংলায় লিখতে আমরা উদ্বুদ্ধ বোধ করেছি। এমন দৃশ্য এখনো পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরা/আসাম থেকে বেড়াতে আসা বাঙালিদের অভিভূত করে, আমাদের ভাষার অহংবোধ কেমন যেন বাড়তি প্রাণশক্তি পায়। কিন্তু এই ইতিহাসটাকে আমরা চিহ্নিত করতে যেন আলস্য প্রদর্শন করি যে, দেশের শিশুখাদ্যের নাম, তার উপকরণ, উপযোগিতা এবং ব্যবহারবিধি অথবা অষুধের প্যাকেট বা পাতার সাথে আবশ্যিকভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী উদ্যোগ। বোঝাতে চাইছি, স্বাধীনতা আমাদের অমন বাড়তি ভাবনা বা কর্মোদ্যোগ সৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাভাবিক ও সুনিশ্চিতভাবেই আমাদের এমন সব প্রত্যাশ্যায় তাড়িত করেছিল, যা ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের সাফল্যের পরও জাতীয় জীবনে পূরণ করা যায়নি।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথাটায় আবার ফিরে আসি। যেহেতু আমার মায়ের ভাষার ওপর সুপরিকল্পিত আঘাত করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে যার দ্বারা আমার জাতীয়তাবাদী সত্তাকে উপেক্ষা এমনকি অস্বীকার করার প্রচেষ্টা ছিল, আহত এবং যুগপৎ বিজয়ী জাতি হিসেবে তাই সমকালীন প্রেক্ষাপটে আমাদের মধ্যেও উর্দুভাষা এবং উর্দুভাষীদের প্রতি এক ধরনের বিরাগ, ক্ষোভ এমনকি ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল। বাঙালিদের মধ্যে অনেকে কৌতূহলবশত, চাকুরি পারার অধিকতর সুযোগের হিসাব কষে, আবার নেহাতই আর একটি ভাষা শেখার সুবিধাকে ব্যবহার করতে উর্দু শিখেছিল। কিন্তু উর্দুভাষীদের আর আত্মীয় বলে বিবেচনার অবকাশ ছিল না। মাতৃভাষার প্রতি অন্ধপ্রেমে ইংরেজিকে প্রত্যাখ্যান বা অগ্রাহ্য করার একটা যুক্তিনিরপেক্ষ মানসিকতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। এবং অবশ্যই তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক বিচারে এর মাধ্যমে বাংলা ভাষার অধিকতর গভীর, ভাবনামূলক ও ব্যাপক বিকাশের পটভূমি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পালা-বদল এমন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করল প্রায় অনিবার্যভাবেই যে, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাকার বিষয় আর রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারের জায়গায় থাকল না।

যে বাংলা ভাষার জন্য অনেকেই প্রাণ দিল এবং যে উর্দুভাষাকে আমরা বর্জন করতে চেয়েছিলাম, এই দুইয়ের বেলায়ই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্ররোচনায় পরিবর্তন দেখা গেল। ভাষা আন্দোলনের ধারা বেয়ে যে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের লাখো মুক্তিযোদ্ধা 'জয় বাংলা' শ্লোগান কণ্ঠে উচ্চারণ ও বুকের ভেতর ধারণ করে শহীদ হয়েছিলেন, সেই প্রাণপ্রিয় শব্দযুগল ও মুক্তিসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য উপাদান 'জয় বাংলা'-কে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। যে শব্দবন্ধ উচ্চারণের জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে লাখো মানুষকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনী সেই একই উচ্চারণের জন্যই ১৯৭৫-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার অনেক বাঙালিকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। বাংলা ভাষা ও বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অবিভাজ্য শ্লোগানের কী করুণ অবমাননা!

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৬৯ সাল থেকেই এই 'জয় বাংলা' শ্লোগান বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল; ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় শহীদ মিনার থেকে দেশের প্রত্যন্ত প্রান্ত পর্যন্ত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটা নিশ্চয়ই গীত হয়েছে, কিন্তু ওই গানের করুণরসকে অতিক্রম করে বজ্রনির্ঘোষে নিনাদিত হয়েছে 'জয় বাংলা'। এই অমর শব্দযুগলকে নির্বাসন দেয়া হল রাষ্ট্রক্ষমতার হাতবদলে। তার বিপরীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদন দেয়া হল 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।' অর্থের দিক থেকে পার্থক্য নেই। কিন্তু 'জিন্দাবাদ'-কে প্রতিস্থাপন করে এই উর্দু শব্দটাকে রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায় থেকে স্বীকৃতি দেয়া হল। একুশে ফেব্রুয়ারি বা বাংলা ভাষার অবস্থান বিষয়ে কোন সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে দিয়ে ডানপন্থী ও পাকিস্তান-ঘেঁষা মানসিকতার প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ ফুটে উঠলো।

আরো একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করি এখানে। এ বিষয়ে বর্তমান লেখক বা অন্যান্যরা অতীতেও লিখেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালের উষালগ্নে অকুতোভয় কতিপয় ব্যক্তি বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নাম দেয়া হলেও পরে 'বিপ্লবী' শব্দটা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামের নয় মাসে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাড়ে ছয় কোটি মানুষকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। মুক্তির বারতাবাহী গান, অসাধারণ জনপ্রিয় চরমপত্র, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও নতুন মুক্তাঞ্চল গড়ার সংবাদ আমরা পেতাম ওই বেতার কেন্দ্র থেকে। স্বাধীন বাংলাদেশে তার নাম হল বাংলাদেশ বেতার। এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার বা তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কোন ষড়যন্ত্রমূলক যোগ ছিল? এ কথার সপক্ষে কোন তথ্যপ্রমাণ নেই।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের পর বাংলাদেশ বেতারের এমন সুন্দর অনুপ্রাসঋদ্ধ নামকে পাল্টে দেয়া হল। সেটা যে কেন হল, তার কোন যুক্তি তখনকার শাসকরা প্রদান করেননি। জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী একটা সামরিক গোষ্ঠীর জনগণের কাছে কোনরকম জবাবদিহিতা ছিল না। কিন্তু 'জয় বাংলা'-র বিপরীতে রাষ্ট্রীয় ভাষ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে যেমন একটা উর্দু শব্দকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, এখানে 'বাংলাদেশ বেতার' হয়ে গেল 'রেডিও বাংলাদেশ'। এই ইংরেজি শব্দটা নিয়ে একটা সহজ সমীকরণ তো হতেই পারে যে, রেডিও পাকিস্তানের সমান্তরালে শুধু দেশের নামটা পৃথক করে দেয়া হল । যেন এর আর কোন বিকল্প ছিল না। এই যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাংলা শব্দের প্রতি প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করা হল, তাতে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষার সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি ঘটানো হবে, না কি এ বিষয়টাকে এখন আর মুখ্য বলে বিবেচনার কিছু নেই এমন সংকেত দেয়া হল, তা নিয়ে সাধারণ মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠল।

বাংলাদেশের ১৯৭৫-উত্তর সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ক্ষমতা বদলের সঙ্গে স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় মূলবোধ পরিবর্তিত হতে থাকে। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেবার মধ্যে গভীর দুরভিসন্ধি ছিল। যদিও একুশে আন্দোলনের সঙ্গে ওই বিষয়টার কোন যোগ ছিল না, কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে, ভাষা আন্দোলনের মূলকথা ছিল ন্যায্যতার অধিকার প্রতিষ্ঠা। সুতরাং পাকিস্তানী আমলে এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যে বৈষম্যের শিকার হয়েছিল, তার স্থায়ী অবসানকল্পে রাষ্ট্রের একটি নৈতিক অবস্থান গ্রহণ প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সেটাকেই স্বীকৃতি দেয়া হয়। এই বিষয়টা বর্তমান রচনার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু এ থেকে নতুন ক্ষমতাসীনদের মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষমতার আশপাশে যারা থাকেন, অথবা যারা অমন মনোভঙ্গির গন্ধ শুঁকতে সক্ষম, তারা ব্যক্তিখাতে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় নির্মাণ করতে লাগলেন। ক্যাডেট কলেজ ব্যবস্থাকে ৬৯'র আন্দোলনের সময় সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির কারখানা বলে চিহ্নিত করা হত, তার সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে দোকানপাটের বাংলা নাম মুছে যেতে লাগলো, ইংরেজিতে লেখা সাইনবোর্ডের প্রচলনও বাড়লো।

অথচ আজও একথা ভাবতে কেমন রোমাঞ্চকর লাগে যে, স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক কালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর অমন বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী সিদ্ধান্ত শুধু বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শ্রোতব্য একটি ভাষা বলে দাবি ঘোষণা করেনি, তাঁর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, উপনিবেশ শাসিত নিপীড়িত তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর কয়েকটি ব্যাংককে জাতীয়করণ করে সেগুলোর সুন্দর বাংলা নাম দেয়া হয়: সোনালী, রূপালী, পূবালী, জনতা, অগ্রণী প্রভৃতি। সামরিক শাসনামলে এবং অদ্যাবধি তারপর যেসব ব্যাংক গড়ে উঠল, সেগুলির নামে বাংলার প্রচলন দেখা গেল না।

হাজার হাজার কিন্ডারগার্টেনের আরও বহু হাজার শিক্ষকদের অনেকে কিন্ডারগার্টেন শব্দের অর্থ জানেন না, অথচ বরগুনার কোন ইউনিয়নে গেলেও দেখা যাবে কিন্ডারগার্টেন স্কুল। একটি প্রধান রাজনৈতিক দল, তাদের সভাপতির পদটিকে 'চেয়ারপার্সন' বলে চিহ্নিত করেছে, ভাইস-চেয়ারম্যানও আছে, কিন্তু সাধারণ সম্পাদক পদটার নাম ঠিকই বাংলায় আছে। এমন সব তামাসা আর তেলেসমাতির মধ্যে যাই থাকুক না কেন, বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলার স্বাক্ষর তো আছেই। ক্ষমতা বদলের ইতিকথা যে একটি দেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা ও সমাজসংস্থাকে কিভাবে যে প্রভাবিত করে, বাংলাদেশ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শফি আহমেদ

সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার

পি-কে-এস-এফ

ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম

উপনিবেশিক শাসনামলে বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চা

ইতিহাসচর্চার ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরনো হলেও বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত খুব বেশী দিনের নয়। উপনিবেশিক শাসনামলেই বাংলায় ইতিহাসচর্চার ধারা শুরু হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে কোলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর গবেষকদের হাতে যখন ভারত বিদ্যার জ্ঞান বিস্ফুরিত হচ্ছিল, তখন থেকেই ইতিহাস চর্চার ধারা শুরু হয়। কোম্পানির স্বার্থে লিখিত এসকল বুদ্ধিজীবীর লেখনীর সূত্র ধরে বাঙালি মনীষীরাও এগিয়ে আসেন। প্রথম যিনি ইতিহাস রচনায় বা বাংলা ভাষায় ইতিহাস নিয়ে নিবন্ধ রচনা করেছিলেন তিনি ইতিহাসের ছাত্র নন। কোম্পানীর কর্মচারীদের ফার্সী ভাষা শেখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত রামরাম বসু বাংলা ভাষায় ইতিহাস লেখা শুরু করেন ।

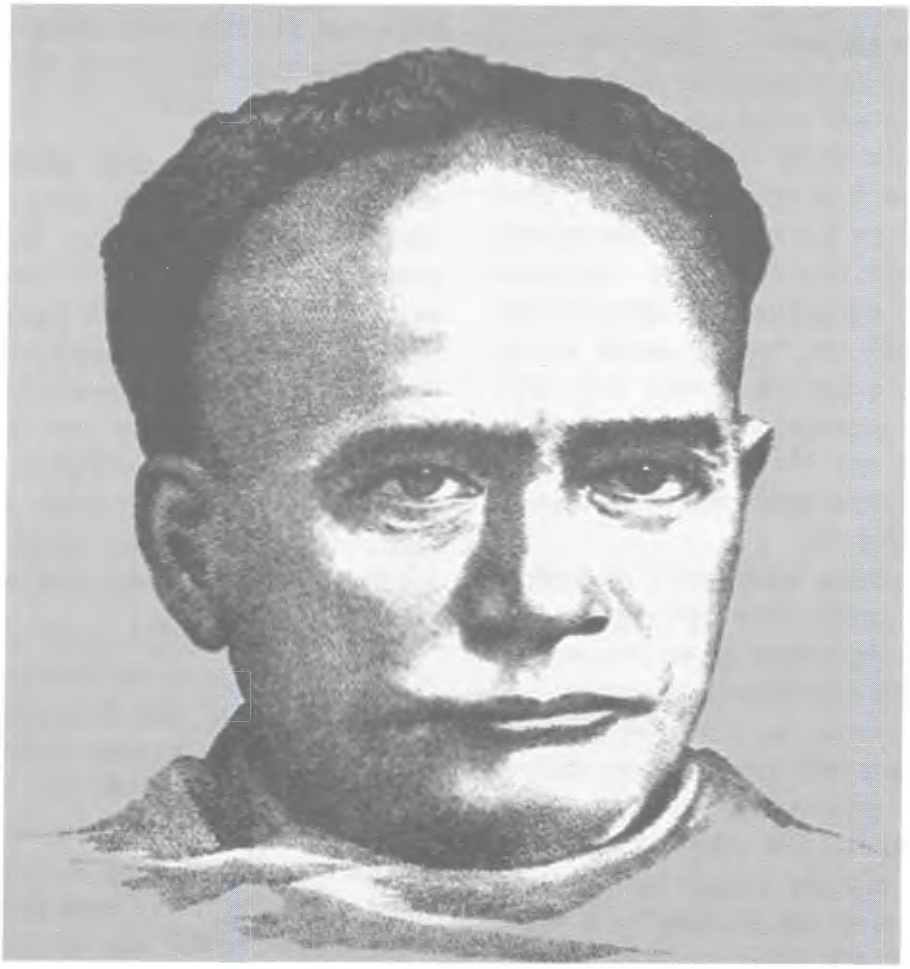

১৮০১ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে তাঁর লেখা *প্রতাপাদিত্য চরিত* বইটি প্রকাশিত হয়।

এরপর স্থানীয় ব্যক্তিদের চরিত্র বা জীবনী নিয়ে লেখা আরো দু' একটি বই দেখা যায়। সাহিত্যিকদের হাত ধরে বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চার ধারা শুরু হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের প্রেস থেকে জন মার্শম্যানের বাংলায় লেখা *ভারতবর্ষের ইতিহাস* বইটি প্রকাশিত হয়েছিল।

বইটির শিরোনামে লেখা হয়েছিল 'ভারতবর্ষের ইতিহাস অর্থাৎ কোম্পানি বাহাদুরের সংস্থাপনাবধি মার্কুইশ হেস্টিংসের রাজশাসনের শেষ বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়দের কৃততারদ্বিবরণ। শ্রীযুত জন মার্শমান সাহেব কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত'।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যানের আউটলাইন অব দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন বাংলার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ। জীবন চরিত বা বায়োগ্রাফি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি চেম্বার্সের বায়োগ্রাফিজ অবলম্বনে জীবন চরিত লেখেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল

শ্রী কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'। চারি আনা মূল্যের এই ইতিহাস বইটি গিরিশ চন্দ্র শর্মা কর্তৃক কোলকাতা থেকে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী এই ইতিহাস বই কেন তিনি রচনা করেছিলেন, তার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা গ্রন্থাকার দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'কোন বিস্তীর্ণ বিষয় অবগত হইতে হইলে অগ্রে তাহার সার ভাগ জ্ঞাত হইয়া স্থূল তাৎপর্য পরিগ্রহ করা কতর্ব্য। তাহা হইলে যখন বিস্তারিত বিবরণ জানিতে আরম্ভ করা যায় তৎকালে সেই প্রাথমিক স্থূল পরিজ্ঞানের সাহায্যে অনায়াসে সমস্ত বিস্তারিত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারে।.... আমিও সেই উৎকৃষ্ট উদ্দেশে অনুবর্ত্তী হইয়া, এই প্রকাণ্ড ভারতভূমির বিস্তারিত বিবরণের সার সংগ্রহ করিয়া 'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রচারিত করিলাম।'

তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সূত্র ধরে এসময়ে বেশ কয়েকজন বাঙালি মনীষী বাংলার ইতিহাস চর্চায় এগিয়ে আসেন। যাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকে প্রকাশিত এই বইগুলো থেকে ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়। পান্ডিত্য, বিচক্ষণ বিশ্লেষণশক্তি ও নিপুণ প্রকাশভঙ্গি ছিল তাঁদের ইতিহাস রচনার বিষয়। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে কোলকাতার ৭৬ নং বলরাম স্ট্রীটের মেটকাফ প্রেস থেকে রংপুর সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক গৌড়ের ইতিহাস বইটি প্রকাশিত হয়। লেখক রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বইটি কৃষ্ণলাল চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী লেখেন, "আমি যখন এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিরূপে ইহার মুদ্রণব্যয় সংগ্রহ করিব, ভাবিতেছিলাম, তখন মালদহের জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী ও স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ইহার মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অর্থ সাহায্য না করিলে ইহা কোনকালে মুদ্রিত হইত না। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বাবু ও হরিশবাবুর সৌজন্য ও বিদ্যোৎসাহিতার বিষয় এদেশে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ।" গ্রন্থখানি প্রকাশের বিষয়ে শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী তদানীন্তন রংপুরের সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক জমিদার সুরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন। *গৌড়ের ইতিহাস* বইটি বাংলা ১৩১৭ সনের ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়েছিল।

পেশাদারিত্ব নিয়ে ইতিহাসচর্চা শুরু করেন রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়। ১৯১৫ ও ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দুই খন্ডে রচনা করেন *বাঙ্গালার ইতিহাস*। বলা যেতে পারে, বাংলা ভাষায় বাংলার ইতিহাস নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা প্রথম দিকের কাজগুলোর মধ্যে এটি একটি। এজন্য তাঁকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের অগ্রপথিক হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাংলা ভাষায় ও বাংলায় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে উপনিবেশিক শাসনামলে এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি (১৯১০-১৯৬৩) বা বরেন্দ্র গবেষণা সমিতি, যা আমাদের কাছে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর নামে পরিচিত। ১৯১৪ সালে সমিতি হিসেবে নিবন্ধিত এই সোসাইটি বাংলার প্রাচীন স্থানগুলিতে অনুসন্ধান, বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা, প্রত্ন-নিদর্শনাবলি ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন গবেষণাকর্ম ও বিরল পাণ্ডুলিপি প্রকাশনার কাজ হাতে নেয়?। বাংলার ইতিহাস রচনায় নতুনরূপে লেখনী ধারণ করে এগিয়ে আসেন শরৎ কুমার রায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ্র। বাংলার শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণায় তাঁদের অভিন্ন আগ্রহ ছিল।

মানুষ ও প্রকৃতির ধ্বংসলীলা এড়িয়ে যেসব সৌধ এখনও টিকে আছে সেগুলির তথ্য উদ্ঘাটন করে অতীত ঐতিহ্য তুলে ধরাই ছিল তাঁদের আজীবন প্রয়াস। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইতিহাস চেতনার সঞ্চার নতুনরূপে দেখা দেয়। ইতোমধ্যে এই সমিতির অন্যতম কর্ণধার রমাপ্রসাদ চন্দ্র ১৯১২ সালে *গৌড় রাজমালা* প্রকাশ করে বাংলার ইতিহাস চর্চাকে উচ্চস্তরে পৌছে দেয়ার কাজটি করেন। *গৌড় রাজমালা* (১৯১২) বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দ্রের পান্ডিত্যের খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে। *গৌড় রাজমালা* ও *গৌড় লেখমালা* গ্রন্থ দুটি প্রকাশের পর *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রাচ্য পন্ডিত বিজয় চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন, 'ইতিহাস সংগ্রহ সংকল্পে যে সকল উদ্যোগ চলিতেছে, তাহা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য'। বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার আরেক নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়-র হাত ধরে। ১৯১২ সালে প্রকাশিত *গৌড় লেখমালা*-য় তিনি কয়েকটি পাল তাম্রশাসন ও লিপিমালার যে বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, তা বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এই প্রকাশনাগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে অদ্যাবধি প্রাচীন বাংলার

ইতিহাস সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস থেকে তথ্যাবলি সংগ্রহের একমাত্র প্রামাণিক সূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। উপনিবেশিক আমলের এ সকল মনীষীরা বা যারা ইতিহাস চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন তারা শুধু শিক্ষিত ভদ্রলোকই ছিলেন না, পশ্চিমি ভাবধারার সাথে তারা পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমি ইতিহাস তত্ত্ব দ্বারা তারা প্রভাবিত ছিলেন। নৈতিকতা, প্রগতিবাদ ও ইতিহাসে বীরপুরুষদের জীবনী বাঙালি ইতিহাসবিদদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রত্নতত্ত্বের ধারার বাইরে এসে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় জীবনীমূলক ইতিহাস রচনা শুরু করেন। তাঁর লেখা *সিরাজউদ্দৌলা, মীর কাসিম, রানী ভবানী* এসব ছিল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পরবর্তী সময়ে আরো বেশ কিছু জীবনীমূলক ইতিহাস অন্যান্যরাও রচনা করেন। ব্রিটিশ অফিসারদের মত বাঙালীরাও ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ইতিহাস রচনা করেছেন। সামাজিক ইতিহাস রচনার এই ধারায় ঘটনাবলী ও জনসাধারণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা জড়িত ছিলেন। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সাহিত্যের সংমিশ্রণ ঘটান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এ কারণে ইতিহাস রচনায় বাস্তবতার স্পর্শ উপলব্ধি করা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাস বইটি ১৯২৮ সালের ১লা জুন কোলকাতার কমলা বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর লেখায় সাহিত্যকে ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেছেন বলে দাবী করেন।

তাঁর রচনার সময়কাল সম্পর্কে বলেন: "ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরম্ভটা বুদ্ধদেবের সময় হইতে তুলিয়া পরীক্ষিতের অভিষেক বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত লওয়া হইয়াছে এবং সেইখান হইতেই ভারতবর্ষের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রমাণ, কেবলমাত্র পুরাণ। পরিশিষ্টে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস অতি সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা হইয়াছে। সে ইতিহাস বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস রামমোহন ও সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।"

সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। উইকিপিডিয়ার মতে, গ্রন্থটি উনিশ শতকের বাঙ্গালীর সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্রনীতির এক উৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য দলিল রূপে পরিচিত। স্বভাবতই রামতনু লাহিড়ীর জীবনীসূত্রে উনিশ শতকের যেসব মনীষী নবজাগরণের সাথে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছেন। জীবনীগ্রন্থ হিসাবে রচিত হলেও বইটির মূল্য যে এর ঐতিহাসিকতায় এ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন।

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও উপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি ইতিহাসবিদরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সতীশ চন্দ্র মিত্রের *যশোহর-খুলনার ইতিহাস* (১৩২৯ বাংলা) ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা কেদারনাথ মজুমদারের *ময়মনসিংহের ইতিহাস*, যামিনীমোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাস (১৩১৯ বাংলা) । ব্রিটিশদের গেজেটিয়ারের আদলে বাঙালিরাই এরকমভাবে লিখতে থাকেন স্থানীয় ইতিহাস। যা আজও যে কোন অঞ্চলের ইতিহাসের আলোচনায় অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। ইতিহাস দর্শন ইতিহাসের মতোই পরিবর্তনশীল। নতুন চিন্তার আলোকে ইতিহাস যুগে যুগে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। গোটা উনিশ শতকে পজিটিভিজম ইতিহাসচর্চাকে প্রভাবিত করেছিল। কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ড হিস্ট্রি চর্চার ঢেউ বাঙালি ইতিহাসবিদদের আকর্ষণ করেছিল। ব্রিটিশ শাসনামলের শেষের দিকে বাঙালি ঐতিহাসিকরা ইতিহাস দর্শনের এদিকটায় ঝুঁকে পড়েন। নীহার রঞ্জন রায়, যদুনাথ সরকার, রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। উপনিবেশিক শাসনামলে বাংলাভাষায় ইতিহাস চর্চার যে ধারা শুরু হয়েছিল, তার ফলে আজ বাংলা ভাষায় লেখা ইতিহাস চর্চা অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে। পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চার জন্য পেশাদারী সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে, যাদের উদ্দেশ্য বাংলা ভাষায় ইতিহাস বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করা, বাংলা ভাষায় ইতিহাসের বই ও সাময়িকী প্রকাশ করা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা যায়। তবেই কল্যাণ, সকলের।

ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

শা ও য়া ল খা ন

একুশ: টেকসই সাক্ষরতা দক্ষতা ও টেকসই উন্নয়ন

টেকসই সাক্ষরতা এবং সাক্ষরতা দক্ষতা কী এবং কেন? সাক্ষরতার বিবর্তন-রূপান্তরই বা কী? বিবর্তিত সাক্ষরতা বা সাক্ষরতা দক্ষতাই কেন উন্নততর সমাজব্যবস্থা এবং টেকসই উন্নয়নের চালিকাশক্তি? টেকসই সাক্ষরতা দক্ষতাই বা কী? অথবা খুব সাদামাটাভাবে যদি বলি সাক্ষরতা কী এবং কেন? সব প্রশ্নের উত্তর একটিমাত্র বাক্যে নিহিত, নিজের জীবনকে সাবলীলভাবে পড়তে পারা, অর্থবহ করে তুলতে পারা। নিজের আশপাশ, পরিবেশ, প্রতিবেশ, সামগ্রিক পরিস্থিতি, বিশ্ব সমাজ-সংস্কৃতি, নিদেনপক্ষে নিজের দেশ, সমাজ সব পড়তে পারা। উল্লেখ্য, এই পড়া শুধু আক্ষরিক পড়াকেই ধারণ করে না। জীবনের সার্বিক বোধ, চেতনা এই ধ্যান-ধারণার উপজীব্য। আমরা দেখতে পাই সাক্ষরতা দক্ষতা এ ধ্যান-ধারণাকে আবর্তিত করেই বিবর্তিত হতে থাকে। এই বিবর্তনের সাথে জড়িয়ে আছে বিশেষ এক প্রেরণা। এই প্রেরণার নাম একুশ। যা আমাদের অনেক বিবর্তনের সাথী।

বিশ্ব সমাজব্যবস্থায় প্রতিনিয়তই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি সমাজব্যবস্থায়, ব্যক্তিগত জীবনে যুক্ত করতে হলে সাধারণ সাক্ষরতার সঙ্গে প্রযুক্তিগত সাক্ষরতাও অর্জন করতে হবে, অর্জিত সাক্ষরতাকে অব্যাহত চর্চার মাধ্যমে আরও শাণিত করতে হবে, তাহলেই বাড়বে সাক্ষরতা দক্ষতা। সেই দক্ষতাই সম্পৃক্ত হবে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়। সমৃদ্ধ হবে বিভিন্ন উন্নয়ন খাত যেমন- উৎপাদন, নির্মাণ, পোশাক, পরিবেশসহ বিভিন্ন সেবাখাত। উল্লিখিত খাতগুলোতে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হলে, সেসব উন্নয়ন সমাজ কাঠামোর একটি বলিষ্ঠ অবস্থান তৈরি করে। এ ক্ষেত্রে সাক্ষরতা দক্ষতা নিজস্ব শক্তিতে জেগে ওঠে। এই শক্তির মূল উৎস ব্যবহারিক সাক্ষরতা। আর সেই জেগে ওঠাই টেকসই উন্নয়ন। টেকসই সাক্ষরতা, টেকসই উন্নয়নের মূলকথা।

একমাত্র সাক্ষরতাই মানুষের জীবনের সব মৌলিক অধিকারকে স্পর্শ করে। এক সাক্ষরতার মাঝেই এতসব সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে ভাবতে অবাক লাগে। সাক্ষরতা হচ্ছে উন্নয়নের বীজতলা এবং দক্ষতা ও প্রযুক্তি হচ্ছে ফসলের বীজ এবং উৎপাদনের কলাকৌশল।

বীজতলা ভালো না বলে ভালো বীজ ও ভালো ফলন দেয় না এবং উন্নত কলাকৌশলও কোনো কাজে আসে না। সুতরাং এটা প্রমাণিত যে, ভালো ফলের অন্যতম শর্ত ভালো বীজতলা। সাক্ষরতা অর্জন শিক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক প্রস্তুতি এবং শিক্ষার অন্যতম শর্ত। সাক্ষরতা অর্জন করেই আমাদের শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং শিক্ষায় সাক্ষরতার বিকল্প নেই।

আমাদের অফিসিয়াল খাতা-কলমে আজ যে সাক্ষরতার গল্প-শিক্ষার হারকে ছাড়িয়ে গেছে, আদতে তার জন্ম ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে লোক গণনার অফিসিয়াল ডকুমেন্ট বা দাফতরিক দলিল-দস্তাবেজে। সাক্ষরতা শব্দটির আবির্ভাব হয়েছে সাক্ষর শব্দটি থেকে। সাক্ষর বলতে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষকে বোঝায়। মোদ্দা কথা, বিদ্যা-শিক্ষা তথা অক্ষরজ্ঞান কাজে লাগিয়ে বিদ্যাচর্চার একটি সহজাত প্রক্রিয়া সাক্ষরতা চর্চা। মানুষের কর্মজগৎ বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষরতার রূপরেখা

বিবর্তিত হচ্ছে। সাক্ষরতা বিবর্তিত হতে হতে টেকসই উন্নয়ন তথা উন্নততর সমাজ ব্যবস্থার চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নততর করতে যত ধরনের কর্মপদ্ধতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য দরকার টেকসই সাক্ষরতা-সাক্ষরতা দক্ষতা।

সাক্ষরতার বিবর্তন একটা ধাবাহিক প্রক্রিয়া। সাক্ষরতা অর্জন যতটা না সময়সাপেক্ষ, চর্চা না থাকলে অর্জিত সাক্ষরতা হারিয়ে যায় তার চেয়ে অনেক দ্রুত। এটা গবেষণায় প্রমাণিত। চর্চার মাধ্যমে যেমন সাক্ষরতা অর্জিত হয়, তেমনি সময়ের চাহিদা অনুসারে সাক্ষরতা বিবর্তিতও হয়। সাক্ষর সমাজ জীবনের বিভিন্ন কর্মপ্রবাহে/ক্ষেত্রে/পর্যায়ে সাক্ষরতাকে সামাজিক পুঁজি করে নিজেদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চাহিদা পূরণ করে চলেছে। তাদের জীবন, জীবিকা ও জীবনচর্চার নানা পরিসরে সাক্ষরতা দক্ষতা প্রভাব ফেলছে। বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই, ১৯০১ সালে সাক্ষরতা বলতে বোঝাত, মাতৃভাষায় নাম স্বাক্ষর করতে পারার ক্ষমতা। আরও অর্ধশত বছর (১৯৫১) পর তাতে যুক্ত হয় স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা যে কোনো বাক্য পড়তে পারার ক্ষমতা। আরও ১০ বছর (১৯৬১) পর ধরে নেয়া হয়, যে বুঝে কোনো ভাষা পড়তে পারে সে-ই সাক্ষর। এর একযুগেরও বেশি সময় (১৯৭৪) পর দেখা যায়, যে কোনো ভাষা পড়তে এবং লিখতে সক্ষম ব্যক্তিকে সাক্ষর হিসেবে গণ্য করা যায়। আবার ১৯৮১ সালে এসে যুক্ত হয়, যে কোনো ভাষায় চিঠি লিখতে পারার ক্ষমতা থাকলে তাকে সাক্ষর বলা যায়। ১৯৮৯ সালে তার সঙ্গে যুক্ত হয় মাতৃভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারা, মৌখিক ও লিখিতভাবে তা ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব করার এবং লিপিবদ্ধ করে রাখার ক্ষমতা লাভ। ২০০৩ সালে এসে সাক্ষরতার পরিসর বিস্তৃত হয় আরও বড় মাপে, যে বাংলা ভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারবে, মৌখিক ও লিখিতভাবে তা প্রকাশ করতে পারবে, সমাজ পরিবেশকে বিশ্লেষণ করতে পারবে, দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী যেমন আলোকচিত্র, লেখচিত্র, পোস্টার, ছবি, চার্ট, কার্টুন ইত্যাদি পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করতে ও তা টুকে রাখতে পারবে।

সময়ের বিবর্তনে বর্তমানে সাক্ষরতায় যুক্ত হয়েছে Life Skill বা জীবন দক্ষতা। জীবন দক্ষতা অর্জন করা না গেলে সমাজে যে কোনো মানুষকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে (স্বাভাবিক জীবনযাপনে) চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বর্তমান সরকার মনে করে দেশবাসী ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন না করলে, জীবনের পরতে পরতে ব্যবহৃত যৌক্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন না করলে সাক্ষরতা বিফলে যাবে। সরকার ঘোষিত ডিজিটাল রূপকল্পও ভেস্তে যাবে। সুতরাং টেকসই সাক্ষরতার সঙ্গে ডিজিটাল রূপকল্প অনেকাংশে নির্ভরশীল। টেকসই সাক্ষরতা টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবার ৮ সেপ্টেম্বর পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়। ১৯৬৬ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি উদযাপিত হয়ে আসছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা জাতীয় পর্যায়ে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য টেকসই উন্নয়ন অপরিহার্য। টেকসই উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য দরকার মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন।

বাংলাদেশ একটি দক্ষতা সমৃদ্ধ সাক্ষর সমাজ গড়ে তুলতে স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ন রকম শিক্ষাবিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন আইন এবং জাতীয় নীতিমালা। এ ছাড়াও 'সবার জন্য শিক্ষা' বিস্তারে সরকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

- **সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা:** ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার সুযোগ প্রদানসহ দেশ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।
- **প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ ১৯৭৪:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৬,৬১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে আরও ২৬,১৯২ টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়।
- **বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০:** এ আইনের মাধ্যমে ৬-১০ বছরের প্রতিটি শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন বাধ্যতামূলক করা হয়।
- **জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১:** জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে নিরক্ষর ও স্বল্প-সাক্ষরদের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।
- **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪:** দেশে সাক্ষরতা বিস্তার, অব্যাহত শিক্ষার আওতায় দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ পাস করেছে।
- **ভিশন ২০২১/ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১১-২১):** এ সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
- **আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে বাংলাদেশের অঙ্গীকার:**
  আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবার জন্য শিক্ষা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ওপর অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ

সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

1. World Conference in Education For All (WCEFA), Jomtien, Thailand, 1990
2. Dakar Framework for Action, Dhaka Framework for Action, Dakar, Senegal, 2000
3. CONEINTEA VI, Belem, Brazil, 2009
4. Istanbul Plan of Action, 2011

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সেই চিন্তা ভাবনায় নিরক্ষরতা দূরীকরণও ছিল একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এই কার্যক্রমকে তাৎপর্যবহ করে তুলতে ১৯৭২ সালে ঠাঁকুরগায়ে বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হলেও ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে সাক্ষরতা কর্মসূচিতে ছেদ পড়ে। পরবর্তী কালে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনের পর থেকে দেশে সাক্ষরতা বিস্তারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যেমন-

ক) সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ ব্যুরো প্রায় ১কোটি ৮০লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করে।

খ) বিভিন্ন আঙ্গিকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশে সাক্ষরতার হার ৩৫.৫% (১৯৯১) থেকে ৫২.৮% (২০০০) তে উন্নীত হয়।

গ) সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে 'ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরষ্কার ১৯৯৮' লাভ করে।

ঘ) ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও UNESCO যৌথভাবে Girls and Women's Literacy and Education: Foundations for Sustainable Development' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে, নারী শিক্ষায় বাংলাদেশের সাফল্য জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে। এ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে UNESCO-`Peace Tree Award' প্রদান করে।

ঙ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পসমূহ-

১. মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১:

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১১-৪৫ বছর বয়সী মোট ৯.৬৭ লক্ষ নব্য সাক্ষরকে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কর্মক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

২. মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২:

উপোরক্ত প্রকল্পের অনুরূপ এ প্রকল্পেও ১১-৪৫ বছর বয়সী মোট ১২ লক্ষ নব্যসাক্ষরকে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৯৫% অর্থাৎ প্রায় ১১.৪০ লক্ষ শিক্ষার্থী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে এবং এদের মধ্য থেকে প্রায় ৪০% শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরণের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়েছে।

৩. শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প :

এ প্রকল্পের অধীনে দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ১,৬৬,১৫০ জন কর্মজীবী শিশুকে মানসম্মত ও জীবন দক্ষতাভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১,৪৬,২১২ জন (৮৮%) শিশু সাফল্যের সাথে মৌলিক শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করেছে। এদের মধ্য থেকে ১৩+ বয়সী ১৭,৬০৪ জন কিশোর-কিশোরীকে জীবিকায়ন দক্ষতার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪. মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা):

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) নামক একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫-৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদানসহ জীবন দক্ষতা শিক্ষা দেয়া হবে।

৫. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল' এর আওতায় 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। এ কর্ম পরিকল্পনায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর 'সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা' সংযুক্ত করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ১৫-৩৫ বছর বয়সী ১০ হাজার নব্য সাক্ষরকে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম:

১. রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প (রস্ক):

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় রস্ক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রায় ১৪৮টি উপজেলায় ৮-১৪ বছর বয়সী প্রায় ৭.৫ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

২. বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম:

সাক্ষরতা প্রসারে সরকারের পাশাপাশি সারাদেশে প্রায় সহস্রাধিক বেসরকারি সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

সাক্ষরতার হার: ২০১৩ সালে বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত

প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৬১% ছিল। উল্লেখ্য, শিক্ষার হার বৃদ্ধির যে ধারা চলমান রয়েছে তাতে বর্তমানে এ হার ৭০% এর কাছাকাছি বলে ধারণা করা যায়।

সাক্ষরতা ও টেকসই উন্নয়নে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় সরকার দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে এবং Vision-২০২১-এ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে তো?

'৭০ এর দশকে ইউনেস্কো কর্তৃক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করা হয় Learning to be: The World of Education, Today and Tomorrow নামে। কমিশনের সভাপতি ছিলেন ফরাসি দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী, খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এডগার ফরে। কমিশন ১৯৭২ সাল নাগাদ প্রতিবেদন তৈরির কাজ শেষ করে। প্রতিবেদনে চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথমত, বিদ্যমান

আন্তর্জাতিক সমাজ, দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রে আস্থা, তৃতীয়ত, সকল উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ খুলে দেওয়া আর চতুর্থত, পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য চাই জীবনব্যাপী শিক্ষা অর্থাৎ অব্যাহত শিক্ষা।

এসব ধারণা চর্চার মধ্য দিয়ে সাক্ষরতার সাথে দক্ষতা সম্পৃক্ত হতে শুরু করে। আধুনিক সমাজ সাক্ষরতা চর্চা বা সাক্ষরতা অর্জন বলতে দক্ষতাভিত্তিক সাক্ষরতাকেই বোঝানো হয়। এই দক্ষতাভিত্তিক সাক্ষরতাই টেকসই সাক্ষরতা। এখন বিশ্ব জুড়ে বলা হচ্ছে সাক্ষরতা দক্ষতা টেকসই সমাজের মূল কথা।

আমরা জানি, সাক্ষরতা আর শিক্ষা এক শব্দ নয়, অর্থও এক নয়। সাক্ষরতা দিয়েই শিক্ষা শুরু। শিক্ষার অর্থ আরও ব্যাপক। আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক বহুরূপে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ধারণ করে নিজের নামে উচ্চশিক্ষার তকমা লাগাতে পারে।

আবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পেয়েও অনেক মানুষ সাক্ষরতা জ্ঞান অর্জন তথা দক্ষতাভিত্তিক সাক্ষরতা অর্জন ও চর্চা করে নিজেকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে টেকসই উন্নয়ন এবং টেকসই সমাজ বিনির্মাণে। প্রশ্ন হলো, আমাদের সাক্ষর সমাজ কি সেই পথে হাঁটছে? রাষ্ট্র কি ঘোষিত সাক্ষর সমাজকে সেই সুযোগ দিতে পারছে? উচ্চতর ডিগ্রিধারীরাই কি টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারছে? সেটারও সন্তোষজনক উত্তর নেই। পরীক্ষা পাসের অবিশ্বাস্য উচ্চ হারের সঙ্গে প্রকৃত উন্নয়নের সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। কারণ আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা সার্টিফিকেট-সর্বস্ব।

২০১৫ সাল সহস্রাব্দ উন্নন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের পর্ব। এমডিজি-র শেষ প্রান্তে এসে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন ৬১ শতাংশ। যে হারে আমাদের সাক্ষরতার হার বাড়ছে, সে হারে আমাদের কর্মসংস্থান বাড়ছে না। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেই সব সময় কর্মসংস্থান বাড়ে না। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। কর্মসংস্থান ছাড়া প্রবৃদ্ধি হলে সেটা টেকসই হবে না।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান জায়েদী সাত্তার বলেন, প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কিন্তু এটা হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। এ জন্য কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে ১৩টি দেশ টেকসই ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তাদের সেই প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থানহীন ছিল না। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেই তারা প্রবৃদ্ধি করেছে। **উন্নয়ন ভাবনায় কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার** বইয়ের লেখক আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার

কর্মসংস্থান বিষয়ক সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা রিজওয়ানুল ইসলাম দেখিয়েছেন, কখনোই বিদ্যালয়ে যাননি কিংবা শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছেন, তাদের মধ্যে বেকার কম। সবচেয়ে বেশি বেকার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করা ব্যক্তিদের মধ্যে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, আমাদের শিক্ষা কি তা হলে কাজে লাগছে না? আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা তাহলে কী শিক্ষা দিচ্ছি?

বাংলাদেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ১৩.৫ শতাংশ। অথচ ভারতে এই হার ৩৫.৮৯ শতাংশ, চীনে ২৩.৭৮ শতাংশ এবং মায়ানমারে ১৯.১২ শতাংশ। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য ২০১৩-১৪ সালে বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৫৪২ দশমিক ৫০ কোটি টাকা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয়ে অর্জিত ২৮২ দশমিক ৮০ কোটি টাকা। এই অর্থের ৭২ শতাংশই ব্যয় হয়েছে বেতন-ভাতাদি ও পেনশন খাতে। রক্ষণাবেক্ষণে গেছে ১৬ শতাংশ। সরাসরি শিক্ষাখাতে তথা ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষা সহায়ক খাতের জন্য অবশিষ্ট ছিল মাত্র ১২ শতাংশ (সূত্র: ইউজিসি প্রতিবেদন, ২০১৪)।

এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য 'সাক্ষরতা আর দক্ষতা টেকসই সমাজের মূলকথা'। কিন্তু বাংলাদেশে এমন প্রতিপাদ্যের মূল প্রোথিত হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। এই আন্দোলন শুধু মাতৃভাষার আন্দোলন ছিল না, এই আন্দোলন ছিল অধিকার, ভাষা, শিক্ষা, উন্নয়ন, সার্বভৌমত্ব সর্বোপরি স্বাধীনতা সব কিছুর মূলে।

২০১৫ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর্ব শেষ হয়েছে। এই যাত্রায় আমরা ভালো করেছি। শিক্ষার হারে উন্নয়ন ঘটেছে। তবে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা এখানেই শেষ নয়। আমাদের আরো অগ্রসর হতে হবে। এখন এসডিজি বা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে একুশের প্রেরণাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে, পরিকল্পনা মোতাবেক অগ্রসর হতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী পাঁচ বছরে এক কোটিরও বেশি লোক শ্রম বাজারে প্রবেশ করবে। বিশ্ব শ্রমবাজারে আমাদের মানবসম্পদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে টেকসই সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কাগজে-কলমে ঘোষিত সাক্ষরতার হার ৬১%- ৭১% শতাংশ হলেও বাস্তবে উল্লিখিত সাক্ষর জনগোষ্ঠী উন্নয়নে বা উন্নততর সমাজ বিনির্মাণে কতটুকু ভূমিকা রাখবে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

মনে রাখতে হবে, নিরক্ষর ব্যক্তিরা সাক্ষরতা অর্জন করলেও অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রাখার সুযোগ সব ক্ষেত্রে পায় না। দক্ষতা অর্জনের মূল কথা হলো অর্জিত সাক্ষরতা চর্চার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই দক্ষতা অর্জনের যাত্রা শুরু আর প্রয়োজনীয় কর্মক্ষেত্রেই দক্ষ জনশক্তিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ এনে দেবে। আমরা কি সাক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় (দক্ষতাভিত্তিক) প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পেরেছি? সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত ও আরো অনেক ভাষা সৈনিকের মহান ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে অর্জিত ভাষা আন্দোলনের অর্জনকে উপযুক্ত মর্যাদার সাথে এগিয়ে নিতে পারছি? এখনো কেন অগণিত, অদক্ষ, নিরক্ষর শ্রমিক কেন অবৈধ পথে দেশ (বাংলাদেশ) ছাড়ছে? বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে? কেন অনাহারে, অর্ধাহারে সাগরে ভাসছে? সোজা কথা মানুষ কেন দেশ ছাড়ছে? সালাম-বরকতের দেশে এসব প্রশ্নের জবাব দেবে কে?

বাংলাদেশে আটটি সাধারণ শিক্ষাবোর্ড আর একটি কারিগরি বোর্ড আছে। অথচ এর বিপরীতটাই হয়া উচিত ছিল প্রয়োজন অনুসারে। তাহলে নব্য সাক্ষরদেরও কারিগরি শিক্ষার আওতায় নেয়া যেত। এদের সাক্ষরতা অর্জন সহজ হতো। কারিগরি শিক্ষায় নজরদারি বাড়িয়ে শিক্ষার মান বাড়াতে পারলে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষিত কারিগর, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন করতে সক্ষম হতাম। বিদেশেও দক্ষ কারিগর, দক্ষ কর্মী রপ্তানি করতে পারতাম।

উন্নয়নশীল দেশ ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়াতে ব্যবহারিক সব বিষয়ে সাক্ষরতার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা সম্পৃক্ত করা হচ্ছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। চুলকাটা, সেলাই, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, চামড়ার কাজ, বাঁশ-কাঠ-বেতের কাজ, নানারকম ব্যবহারিক কাজ, খাবার তৈরির কাজ-কী নেই ওখানে! পক্ষান্তরে, আমাদের সাক্ষর সমাজ, শিক্ষিত বেকার এবং সাক্ষরতা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তদের ব্যবহারিক শিক্ষার আওতায় এনে আমরাও বদলে দিতে পারি আমাদের দেশটাকে। আমরা পারি বিবর্তিত সাক্ষরতাকে টেকসই উন্নয়ন: টেকসই সমাজ এবং উন্নততর সমাজব্যবস্থার চালিকা শক্তিতে রূপান্তরিত হতে। তা হলেই একুশের অর্জন বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

শাওয়াল খান

লেখক ও গবেষক

কুমার প্রীতীশ বল
মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা

মাতৃভাষা শিশুর প্রথম ভাষা। এ ভাষার মাধ্যমেই শিশু তার পরিবেশকে চিনতে শেখে, যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং পরিবেশ প্রতিবেশের কার্যকারণ সম্পর্কগুলো বুঝতে পারে। শিশুর শিক্ষার শক্তিশালী ভিত রচনার জন্য মাতৃভাষাই প্রথম কার্যকর ভাষা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, পরবর্তী শিক্ষার একটি শক্তিশালী বুনিয়াদ তৈরি করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অন্তত ৫ বছর মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) অনুচ্ছেদ-২৮ (১)-এ সমান সুযোগের ভিত্তিতে শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সহজলভ্য এবং স্কুলে শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং ঝরে পড়ার হার কমানোর কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৯(১)-এ শিশুর পিতামাতার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শিশু যে দেশে বসবাস করে সে দেশের মূল্যবোধ, শিশুর নিজস্ব মাতৃভূমিসহ অপরাপর সভ্যতার প্রতি সম্মানবোধকে জাগিয়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

৩০নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'যে দেশে জাতিগত, গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনগণ রয়েছে, সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিজ সংস্কৃতি বজায় রেখে, ধর্মের কথা প্রকাশ এবং চর্চা করা অথবা নিজ ভাষা ব্যবহার থেকে ঐ ধরনের আদিবাসী সংখ্যালঘুদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।' তিনটি অনুচ্ছেদে আদিবাসী শিশুর জন্য নিজস্ব ভাষায় লেখাপড়া ও নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি অধ্যয়নের সুযোগ দানের কথা স্বীকার করা হয়েছে। আইএলও সনদ নং ১০৭ ধারা-২৩ তে আছে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর শিশুদের তাদের মাতৃভাষায় পড়ালেখা শেখাতে হবে।

আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত খসড়া জাতিসংঘ ঘোষণা ২০০৬ {ধারা ৭ (২): 'স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে আদিবাসী জনগণের স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও সুরক্ষিতভাবে জীবনধারণের সামষ্টিক অধিকার রয়েছে'।

সবার জন্য শিক্ষা- 'আমাদের মিলিত অঙ্গীকার' শিরোনামে ডাকার কর্ম-পরিকল্পনার ৭-এর(খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের মধ্যে যাতে সকল শিশু শিক্ষা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। মেয়ে শিশুসহ যে সব শিশু কষ্টকর জীবন যাপন করছে বা বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তাভুক্ত- সকলেই যাতে বিনা ব্যয়ে মানসম্মত ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পায় এবং তা সম্পন্ন করতে পারে- এটা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও এমডিজিতেও (২০০০) আদিবাসীসহ সকল শিশু শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈষম্য না করার কথা বলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং বৈষম্য হ্রাসসহ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণা, নীতিমালা ও দলিলে অনুস্বাক্ষর করার পাশাপাশি ইতোমধ্যে বেশকিছু আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ ধারায় ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান ভেদে কোনো ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৫ ও ১৭ ধারায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, গণতন্ত্রভিত্তিক সর্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ১৯৯৭ (The Chittagong Hill Tracts Peace Accord of 1997) অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি জেলা পরিষদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা (অংশ-খ, ধারা-৩৩-বি)। দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র বা PRSP-তে আদিবাসী শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

১. পার্বত্য শান্তিচুক্তির (১৯৯৭) পূর্ণ বাস্তবায়ন;

২. প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ এবং সে অনুসারে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং

৩. আদিবাসী-অধিকার রক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মার্চ ২০০৮ সালে প্রকাশিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামোর উদ্দেশ্য অংশে বলা হয়েছে, 'শিশুদের লিঙ্গ, সামর্থ্য এবং ভাষাগত ও জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে শিশুদের উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির জন্য একটি পাঠ্যক্রম কাঠামো তৈরি করতে হবে যাতে শেখার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, ফলাফল, ধারাক্রম এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে নির্দেশনা থাকবে।' ইসিডি পলিসি ২০০৯-এ সংখ্যালঘু আদিবাসীসহ ০ থেকে ৮ বছর বয়সী সকল শিশুকে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর ২৩ নং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো (পৃষ্ঠা-২)। এই নীতি অনুসারে বিদ্যালয় প্রস্তুতির লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সংস্থান রয়েছে, তবে সেখানে শিক্ষার মাধ্যম প্রসঙ্গে কিছু বলা নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষাদান কৌশল হিসেবে-অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রঙ, নানা ধরনের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সঙ্গে ছড়া, গল্প গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। (পৃষ্ঠা-৩)। তবে, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে আদিবাসী শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা হলো- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে (পৃষ্ঠা-৪)।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-দুই (PEDP-II)-এর আওতায় আদিবাসী শিশুর শিক্ষার উন্নয়নে ২০০৬ সালে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ :

১. আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা দানের জন্য স্থানীয় এবং আদিবাসী ভাষা জানা আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ।

২. নিয়োগকৃত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।

৩. প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদান।

৪. পাঠ্যসূচিতে আদিবাসী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সংযুক্ত করা হবে।

৫. বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন বিদ্যালয় স্থাপন।

৬. স্কুল ব্যবস্থাপনায় আদিবাসী অভিভাবকদের সম্পৃক্তি।

৭. স্কুলের পাঠ্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং

৮. স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই স্কুল পঞ্জিকা প্রচলন করা হবে।

আন্তর্জাতিক ঘোষণা এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে। বাংলাদেশ সরকার আদিবাসীদের অধিকার, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, বৈষম্য কমানো এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে যে সব চুক্তি বা সনদে স্বাক্ষর করেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯)। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯১ সালে এ সনদ অনুসমর্থন করে। এছাড়া, আদিবাসী জনগোষ্ঠীবিষয়ক আইএলও সনদ নম্বর ১০৭ (ধারা-২৩) বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে অনুসমর্থন করে।

আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস-এর হিসাবমতে (১০ নভেম্বর ২০১০ জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে ঘোষিত) বাংলাদেশে ৭৫টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জাতীয় আইন ২০১০ অনুসারে ২৭টি) প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ বসবাস করে। এদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য। কিন্তু দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুরা যে-সব বাধার সম্মুখীন তার মধ্যে ভাষাগত সমস্যা অন্যতম। তাছাড়া যারা স্কুলে যায়, তাদের একটি বড় অংশ ৫ম শ্রেণির সমাপ্ত করার আগে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। তার মধ্যে ভাষাগত সমস্যার কারণে ঝরে পড়ে ৩৫% শতাংশের বেশি। পাঠ্যপুস্তকসহ স্কুলগুলোতে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির অনুপস্থিতির কারণে আদিবাসী শিশুরা স্কুলে যেতে চায় না।

ফলে তারা লেখাপড়া থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

১৯৯০ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করাসহ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে শতভাগ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে বলে মনে করা হলেও এর সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এলাকার পার্থক্য রয়েছে। এখনও আদিবাসী শিক্ষার্থীদের স্কুলে গমন হার অনেক কম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ব্রিটিশ শাসনামলের মাঝামাঝি সময় থেকে বৃহত্তম পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে আদিবাসী শিশুদের জন্য স্কুল শিক্ষা চালু ছিল। কিন্তু আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখে শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো স্কুল স্থাপন হয়নি অথচ যা ছিল খুবই জরুরি।

দেশের প্রায় সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবই অনুসরণ করা হয় এবং এগুলোর ভাষা বাংলা। এসব পাঠ্যপুস্তক মূলত বাংলাভাষী বাঙালি শিশুর পাঠ, বোধগম্যতা এবং মানসিক বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এগুলো মোটেও আদিবাসী শিশুর শিক্ষাগ্রহণের জন্য বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত নয়। এক্ষেত্রে মৌলিক শিক্ষার সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আদিবাসী শিশুরা, যা ইউনিসেফের শিশু অধিকার রক্ষার ধারার স্পষ্ট বিরোধী। তাই আদিবাসী শিশুর জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিক লক্ষ করে তাদের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নাইজেরিয়া এবং ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের শিক্ষা উন্নয়নে গৃহীত সরকারি উদ্যোগ ও ভূমিকা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। অনেক আগেই ভারতের ত্রিপুরা এবং মিজোরামে মিজো এবং ত্রিপুরা (ককবরক) ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনাসহ শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। এখানে বঙ্গলিপিতে ককবরক ভাষায় আদিবাসীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ত্রিপুরায় বসবাসকারী ত্রিপুরা, নোয়াতিয়া, রিয়াং, জমাতিয়া, কলই এবং রূপিনী জাতিসত্তাসমূহ ওই ককবরক ভাষার অনুসারী। আবার পশ্চিম বাংলায় ১৯৭০ সালে সাঁওতালদের জন্য এ রকম একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনাগত মত পার্থক্যের জন্য তা বন্ধ হয়ে যায়।

ভিয়েতনামের অবিচ্ছিন্ন জাতীয় সাংস্কৃতিক ধারা থেকেও আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারি। এখানে ৫৪টি জাতিসত্তার লোকসকল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে। সাধারণভাবে সর্বত্র ভিয়েতনামী ভাষার প্রচলন থাকলেও সকল জাতিসত্তার নিজ নিজ ভাষা এবং সাংস্কৃতিক অধিকার অক্ষুন্ন রয়েছে। এখানে জাতিসত্তাসমূহ নিজ নিজ ভাষায় কথা বলে। নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি চর্চায়ও কোনো বাধা নেই। সরকার এ সকল ভাষা ও সংস্কৃতি লালন ও বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা করছে। এখানে সরকারিভাবেই প্রতিটি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এত ভিন্নতা সত্ত্বেও এখানে জাতিগত কোনো বিরোধ নেই। আছে বহিরাগত শক্তি প্রতিরোধের সম্মিলিত প্রত্যয়।

মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই যে কত হৃদয়বিদারক হতে পারে তা বাঙালির চাইতে বেশি কেউ জানে না। বাঙালি তার মাতৃভাষার অধিকার সার্বিকভাবেই প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বহুভাষিক বাংলাদেশের অপরাপর জাতিসত্তার মাতৃভাষার অধিকার নিশ্চিত হয়নি। অত্যন্ত মর্মান্তিক সত্য হলো, বাঙালির পরবর্তী কালে ভাষা আন্দোলনের মর্মবাণী বিস্তৃত হয়। পারিপার্শ্বিক জাতিসত্তাসমূহের সঙ্গে বাঙালি ক্ষমতাধর শাসকের মতো আচরণ শুরু করে। আদিবাসী লোকসকলকে স্বাধীন দেশে পরাধীন জাতির মতো মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী দশকের (১৯৯৫-২০০৪) কার্যক্রমসমূহের এটি একটি ছিল শিক্ষা। কিন্তু সর্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মাতৃভাষা চর্চার অধিকার। বাংলাদেশের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার অধিকার এখনও নিশ্চিত হয়নি।

আমরা তো জানি ভাষা শুধু ভাবের বাহন নয়, প্রত্যেক জাতি নিজস্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে তার জাতির প্রাণসত্তাটি বিকশিত করে তুলে। মানুষ মাতৃজঠর থেকে মুক্তি লাভ করে যে ভাষার মাধ্যমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে, সেই মধুময় প্রাণপ্রিয় ভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষায় শিক্ষা লাভ করা যেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার, ঠিক তেমনি মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাও সঠিকভাবে প্রকাশে ব্যর্থ হয়। আর তাই হয়তো এ ভাবনায় ভাবিত হয়ে বাঙালি কবি প্রশ্ন করেছেন--

'নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা?'

এখানেই প্রশ্ন এসে যায়, আদিবাসীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সম্ভাবনা কতটুকু? ব্যক্তিগতভাবে আমি এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি বহুবার। কারণ, আদিবাসীদের খবরাখবর রাখতে আমি চেষ্টা করি এবং সুযোগ পেলে, ডাক পেলে তাদের যে কোনো কাজে যুক্ত হতে গর্ববোধ করি। আমার ধারণা, এ

ব্যাপারে যাঁরা কথা বলেছেন এবং ভেবেছেন, তাঁরাও একই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। এক্ষেত্রে সম্ভাবনা যাচাইয়ের আগে আদিবাসীদের অনীহার কারণ খুঁজতে চেয়েছি। তখনই আমাদের উপলব্ধিতে আসে, স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষার ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারণের কারণে বাংলাদেশে বসবাসকারী মাতৃভাষা বাংলা নয়, এমন সকল জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরবর্তী কালে সেই জাত্যাভিমানে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প তাকে আরও রক্তাক্ত করে তোলে। ফলে এ দেশে কখনই অপরাপর জাতিসত্তাসমূহের ভাষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি শাসক শ্রেণির সহমর্মিতা লাভ করেনি। স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার মতো প্রয়োজনীয় জল-হাওয়া পায়নি। এরই প্রভাব পড়েছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাসহ সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায়। শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অনাগ্রহ এবং ধারণাগত সীমাবদ্ধতা। পাঠ্যপুস্তকসমূহেও আদিবাসীদের জীবনযাত্রা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির কোনো প্রতিফলন নেই। এছাড়াও রয়েছে আর্থসামাজিক বৈষম্য এবং শিক্ষার পদ্ধতিগত সংকট ও ভাষা সমস্যা। আদিবাসী শিক্ষার্থীরা যেমন বাঙালি শিক্ষকদের ভাষা বুঝতে পারে না, ঠিক তেমনি শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের ভাষা এবং আচরণের সঙ্গে অভ্যস্ত নয়। ফলে শিক্ষালয়ে পাঠদানের পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে। যা কি-না পাঠের সময়ে আদিবাসীদের বেদনাহত করে। এ সকল নানাবিধ কারণে অপরাপর বিষয়সমূহের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও আদিবাসী লোকসকল বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে অছ্যুৎই থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে বেসরকারি উদ্যোগে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের সঙ্গে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে আমার সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করতে গর্ববোধ করছি। জাতীয় আদিবাসী পরিষদ গ্রামীণ ট্রাস্টের দারিদ্র্য বিমোচন গবেষণা কর্মসূচির অর্থায়নে সাঁওতাল শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার বর্ষাপাড়া গ্রামে ১৯৯৯ সালের ২০ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম সাঁওতাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার এটাই ছিল প্রথম উদ্যোগ। ফলে ধনুক ধরা সাঁওতাল শিশুর হাতে বই ওঠে। পরবর্তীকালে এখানে আরও চারটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সাঁওতাল শিশুরা প্রথম যেই পুস্তকটি হাতে পায়, ঐটির নাম, 'গিদরৌ কোয়াঃ পাঁহিল পুথি' অর্থাৎ প্রথম পাঠ। প্রথম বই হাতে পেয়ে সাঁওতাল শিক্ষার্থীরা আনন্দের আতিশয্যে সমস্বরে উচ্চারণ করে, 'অ-তে অলঃ পড়হাঃ চেদ মা বোন, আ-তে আঃ সার মেনাঃ তি ঞ' অর্থাৎ লেখাপড়া শিখবো মোরা, তীর ধনুক আছে আমার।

বাংলা ভাষার মতোই সাঁওতাল ভাষায়ও স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। তবে এখানে অতিরিক্ত দুটি স্বরবর্ণ ও ছয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। আর আছে একটি অতিরিক্ত চিহ্ন। এটি হলো বাংলা (ৗ, ঔ চিহ্ন) চিহ্নের শেষ অংশ ৗ। জাতীয় আদিবাসী পরিষদ এটিকে বঙ্গলিপিতে সাঁওতালি ভাষা বলছে। গ্রামীণ ট্রাস্টের অর্থায়নে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ সাঁওতাল শিশুদের স্কুলগামী করার লক্ষ্যে প্রথম বইটি রচনা করে। অতঃপর তাঁরা বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে একটি লেখক প্যানেল তৈরি করে। এখান থেকেই আমি সম্পৃক্ততা খুঁজে পাই এবং নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজেকে ঋদ্ধ করি। এই প্যানেলে সাঁওতাল ভাষা বিশেষজ্ঞও ছিলেন।

সম্মিলিত উদ্যোগে প্রথমে সাঁওতাল ভাষায় রূপকথার বই 'সেবেলে সড়ম বিসীবোন আন্ধুম' লেখা হয়। পরে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়। ফলে সাঁওতাল শিশুরা তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভাষার পরিবর্তে মূলভাষা হিসাবে সাঁওতালি ভাষা শেখে। অবশ্য তারা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলাও শেখে। যাতে পরবর্তী কালে মূলধারায় শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়। আদিবাসী জনসমাজে শিক্ষার বিস্তার এবং তাদের নিজস্ব ভাষা, ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি সাঁওতাল ভাষায় প্রণীত বইসমূহে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য রক্ষা এবং তাদের এদেশের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটানো।

এ সকল সাঁওতাল স্কুল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের মতোই পরিচালিত হয়। একজন শিক্ষক ৩০জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করেন। শিক্ষালয়সমূহের সকল শিক্ষকই সাঁওতাল নারী। প্রথম শিক্ষালয়ের শিক্ষক হলেন বর্ষাপাড়া গ্রামেরই দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী পরী টুডু। দশম শ্রেণির পর তাঁর পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই সাঁওতাল স্কুল তাঁকে আবার উদ্যমী করে তুলে। পরী টুডু এখন স্বপ্ন দেখছে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের, একই সঙ্গে সাক্ষর করে তুলবে নিজ জনগোষ্ঠীর সকল শিশুকে। একদিন যেখানে অভিযোগ ছিল, সাঁওতাল শিশুরা স্কুলে যায় না। সেখানে আমরা এসে দেখলাম ভিন্ন চিত্র। সাঁওতাল শিশুরা স্কুলে অনুপস্থিত থাকে না। অবশ্য এই স্কুল জাতীয় আদিবাসী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত স্কুল, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়।

বান্দরবানে বসবাসরত আদিবাসী ম্রো জাতিসত্তার শিশুদের জন্য পুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা প্রথম শিশু শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে সক্ষম

হয়েছে। ১৯৯৮৫-৮৬ সালে ম্রো জনগোষ্ঠীর কৃতি পুরুষ মেনলে ম্রো ম্রো বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। এর আগে ম্রো সমাজের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা ছিল না।

বর্তমানে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থা দীর্ঘদিন থেকে 'মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা' কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে বেশ অগ্রগতিও হয়েছে। নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন করে সংস্থাসমূহ এই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ সকল উদ্যোগ তুলে ধরার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান ও সহযোগী সংস্থাসমূহ সম্মিলিতভাবে 'মাল্টি-লিংগুয়াল এডুকেশন ফোরাম (এমএলই ফোরাম)' গঠন করেছে।

এই ফোরাম ২০১১ সালে 'বাংলাদেশে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম' শীর্ষক একটি ম্যাপিং স্টাডি পরিচালনা করে। ইউনেস্কো'র আর্থিক সহায়তায় এমএলই ফোরামের পক্ষে 'গবেষণা ও উন্নয়ন কালেক্টিভ' এই ম্যাপিং স্টাডিটি পরিচালনা করে। বাংলাদেশে আদিবাসীদের জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক কী কী ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, কারা এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে, কী ধরনের শিক্ষাক্রম ও উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে ইত্যাদিসহ আনুসাঙ্গিক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত এই ম্যাপিং স্টাডিতে উঠে এসেছে। এছাড়াও আগামীতে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে এমএলই কার্যক্রম সম্প্রসারণে সংশিষ্ট বিশিষ্টজন ও সংগঠনের সুপারিশ এই স্টাডিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এখান থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ৭৮টি আদিবাসী ও অ-আদিবাসী জাতিসত্তার জন্য ১০২টি সংস্থা ২৯টি জেলার ১১২টি উপজেলায় মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্থাসমূহ হচ্ছে- ব্র্যাক, সেভ দ্য চিলড্রেন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, জাবারাং কল্যাণ সমিতি, আশ্রয়, কারিতাস বাংলাদেশ, সান্তাল এডুকেশন সেন্টার। এছাড়া ব্র্যাক ও সিল-বাংলাদেশের অনেক সহযোগী সংস্থা ছোট ছোট আকারে দেশের বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এমএলই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাক্রম পরিচালনা করছে।

স্টাডি থেকে জানা যায়, মোট ৫টি আদিবাসী ভাষায় নিজস্ব বর্ণমালা আছে। এগুলো হলো- চাকমা, চাক, মার্মা, ম্রো ও তঞ্চঙ্গা। ৮টি আদিবাসী ভাষায় বর্ণমালা হিসেবে রোমান এবং ৫৮টি আদিবাসী ভাষায় বর্ণমালা হিসেবে বাংলা-কে গ্রহণ করে উপকরণ উন্নয়ন করা হয়েছে।

সরকার আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসাবে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে। প্রথম পর্যায়ে চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, গারো ও ওঁরাও(সাদ্রি) ভাষাভাষী আদিবাসী শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকা উন্নয়ন করা হবে। সরকারের সিদ্ধান্ত হলো, আদিবাসী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক থেকে ধাপে ধাপে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে জাতীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করানো হবে। তবে সাঁওতাল বর্ণমালা বিষয়ে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের কারণে এ ভাষায় উপকরণ উন্নয়ন কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

পর্যায়ক্রমে সকল আদিবাসীর জন্য নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এর অঙ্গীকার অনুসারে সকল আদিবাসীর জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে। আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সংক্রান্ত সামগ্রিক বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সরকার ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। উপকরণ উন্নয়নের জন্য এনসিটিবি একটি উপকরণ উন্নয়ন কমিটি গঠন করেছে।

২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ৫টি আদিবাসী ভাষায় শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ২০১৬ সালে এসেও তা শুরু করা সম্ভব হয়নি। ২০১৫ সালের মার্চ ও মে মাসে NCTB কর্তৃপক্ষ প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য পুস্তক রচনার জন্য ২১ দিনের কর্মশালা পরিচালনা করে। শুধু পুস্তক রচনাই শেষ কথা নয়। এর জন্য দরকার শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থী নির্বাচন। ২০১৬ সালের শিক্ষা কার্যক্রম এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আদিবাসী নৃ-তাত্ত্বিক প্রশান্ত ত্রিপুরার যখন প্রশ্ন করেন, 'চাকমা উপন্যাস পেলাম, কিন্তু চাকমা বাল্য শিক্ষার খবর কী?' এক বুক কষ্ট নিয়ে তখন বলতে হয়, মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো সুখবর নেই।

কুমার প্রীতীশ বল
উপকরণ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ
দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, ব্র্যাক

রতন সরকার

শিক্ষার মাধ্যমঃ প্রয়োজন যুগোপযোগী বিশ্লেষণ

দেশে ক্রমান্বয়ে ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। একই সাথে শিক্ষাকে পণ্যের মত কিনে নিতে আগ্রহী লোকের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। অথবা অন্যভাবে ভাবা যেতে পারে যে, টাকা খরচ না করলে শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই শিক্ষার পেছনে টাকা ঢালতে লোকে দ্বিধা করছে না। এখন শহরের গৃহকর্মী অথবা গ্রামের দিনমজুর; তিনি বাবা অথবা মা, নারী বা পুরুষ যেই হোন না কেন, শিক্ষার পেছনে সাধ্যমত টাকা খরচ করতে দ্বিধা করছেন না। কখনও কখনও সেই চেষ্টা সাধ্যের অতিরিক্ত পর্যায়েও চলে যাচ্ছে। তাহলে একথা বলতেই হচ্ছে যে, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এখন আর কোন নির্দিষ্ট বলয়ে সীমাবদ্ধ নেই।

এখন আসি শিক্ষার মাধ্যম প্রসঙ্গে। শিক্ষার জন্য প্রয়োজন একটি বাহন, যা একজনের চিন্তা, ধারণা, অভিব্যক্তি অন্যের মধ্যে পরিবাহিত করে। এই বাহনটি হলো ভাষা। এখন যুগের প্রয়োজনে ভাষাও একটি আন্তর্জাতিক রূপ পেতে যাচ্ছে। টেলিভিশন ঘরে ঘরে, ইন্টারনেটও গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছে। অসম্ভব শক্তিশালী এসব যোগাযোগ মাধ্যম গোটা বিশ্বটাকে আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দিচ্ছে না।

ইন্টারনেটের কল্যাণে গ্রামের একটি লোকও আমেরিকার একটি লাইব্রেরীতে ঢুকতে পারছে। প্রশ্ন হলো, এই যোগাযোগের মাধ্যমটি কী? আমেরিকার ক্ষেত্রে উত্তরটি যদি ইংরেজি হয়, তাহলে জাপানের ক্ষেত্রে কী? একদা জাপান মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়ে অতীব যত্নশীল ছিল। জাপানে পিএইচডি করতে গেলে জাপানি ভাষা শিখতে হয়। কিন্তু জাপান কি সেই অবস্থানটিতেই আছে? অথবা থাকতে পারছে? উত্তরটি হলো- 'না'(সূত্রঃ প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারী, পৃষ্ঠা ১০, 'উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত?')। জাপানের প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিদেশী শিক্ষক বাড়িয়ে দেয়ার কথা বলেছেন। সম্ভবত, তিনি যুগের প্রয়োজনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন।

আসা যাক ভাষা শেখার বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। তিনি বিদেশী ভাষা শেখার আগে মাতৃভাষার গাঁথুনির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মাতৃভাষার গুরুত্বকে মোটেও খাটো না করেও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ভাষা শেখার গুরুত্বকেও ছোট করে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে আমরা কী করবো?

এইক্ষণে শিশুর শেখার ক্ষমতা ও মস্তিষ্কের বিকাশের আধুনিক আবিষ্কার সম্পর্কে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের সময়ে মস্তিষ্কের বিকাশ ও তার পর্যায় সম্পর্কে অনেক তথ্যই অজানা ছিল। এখন বলা হচ্ছে, শিশুর শেখার ক্ষমতা অসীম এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে সঠিক সময়ে তাকে সক্রিয় ও সংগঠিত করে গড়ে তুলতে হয়। এটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় শৈশব। এই সময়ে শিশুর মস্তিষ্ক যে হারে সক্রিয় ও সংগঠিত হতে পারে, বয়স বেড়ে গেলে সেটি আর ঘটে না। তাই এই সময়েমাতৃভাষা শেখার পাশাপাশি অন্য ভাষাও শিশুর পক্ষে শেখা সম্ভব। সঠিক পরিবেশ দেয়া সম্ভব হলে এটি তার

জন্য বোঝা নয়।

লক্ষ করলে দেখবেন, ঢাকা শহরের অনেক শিশু তিনটি ভাষাতে গড় গড় করে কথা বলতে পারে। প্রথমটি হলো মাতৃভাষা যা সে পরিবার থেকে শিখেছে, দ্বিতীয়টি ইংরেজি যা সে স্কুল থেকে শিখেছে এবং তৃতীয়টি হলো হিন্দি যা সে টেলিভিশন থেকে শিখেছে। এই তৃতীয় ভাষাটি কেউ তাকে যত্ন করে শেখায়নি অথবা সে নিজেও কষ্ট করে শেখেনি। টেলিভিশনে সিনেমা বা সিরিয়াল দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই শিখে ফেলেছে। অতএব, যদি তাকে যত্ন করে, সচেতনভাবে শেখানো হতো তাহলে সে আরও ভালভাবে শিখতে পারতো। একই কাজ যদি আমরা বড়রা করি তাহলে কি তাদের মতই দ্রুততার সাথে শিখতে পারবো? উত্তর হলো, না। আমাদের দ্বিতীয় ভাষা শেখার কষ্ট পেতেই হবে যা শিশুর ক্ষেত্রে হবে না। সুতরাং শিশু যদি শিখতে পারে, তাহলে তাকে থামাবো কেন?

মাতৃভাষাকে অবহেলা না করেও শিশুরা মাতৃভাষার সাথে আরও একাধিক ভাষা শিখতে পারে। প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে এই সহজাত ক্ষমতা রয়েছে। তাহলে আমাদের উচিত হবে, মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্য যে ভাষা জানা তাকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সহযোগিতা করবে, সেটি শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা।

স্বনামধন্য কগনিটিভ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও ভাষাবিদ স্টিভেন পিঙ্কার যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মানুষের ভাষার ক্ষমতা সহজাত ও অন্তর্জাত আচরণ যা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আকার পায়। এই অন্তর্জাত ক্ষমতা আমাদের যোগাযোগের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। স্টিভেন পিঙ্কারের এই ধারণা নোয়াম চমস্কির 'ভাষা হলো অন্তর্জাত মানসিক শক্তি বা ক্ষমতা' এই তত্ত্বকে জনপ্রিয় করেছে। পিঙ্কার ভাষা শিক্ষাকে মানুষের অনন্যসাধারণ গুণ হিসেবে দেখেছেন, যা সমাজে মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়। স্টিভেন পিঙ্কার স্বীকার করেছেন যে, তিনি চমস্কির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং এই তালিকায় আরো আছেন এরিক লেনবার্গ, জর্জ মিলার, রজার ব্রাউন, মরিস হেল এবং আলভিন লিবারম্যান। স্যাম্পসন অন্তর্জাত ভাষার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বটে, তবে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে শিশুরা ভাষা শিখতে পারে কারণ 'মানুষ সবকিছু শিখতে পারে'। সুতরাং একথা বলতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, শিশুর ভাষা শেখার ক্ষমতাকে কোন ভাষা বিজ্ঞানীই অস্বীকার করছেন না।

ইতোমধ্যে পৃথিবী বৈশ্বিক গ্রামে রূপ নিয়েছে। ক্রমে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত আরও ঘনীভূত যোগাযোগের জালে সংগঠিত হবে। আমরা এই অপ্রতিরোধ্য গতির সাথে তাল না মিলিয়ে একে দূরে ঠেলে রাখতে পারবো? প্রচণ্ড গতির এই বিশ্বায়নের যুগে আমরা কি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করি?

আউটসোর্সিং বর্তমানে বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় এবং আয়ের একটি বড় উৎস হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। আশা করা যায় এই ক্ষেত্র ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে। বাংলাদেশীদের মেধা ও যোগ্যতা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এসকল কারিগরী ক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা করে নিতে হলে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন ছাড়া উপায় কি? এক্ষেত্রে ইংরেজির গুরুত্বকে স্বীকার করতেই হবে।

সুতরাং আমাদের একটি সমঝোতায় আসতে হবে। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর সাথে আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও ইতিহাস জড়িত। এই সবই জাতির পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করে। তাই মাতৃভাষার চর্চাকে খাটো করে কোন পদক্ষেপই আমরা নিতে পারি না। কিন্তু সেই সাথে আন্তর্জাতিক ভাষাকে অবধারিতভাবে স্বাগত জানাতে হবে। তার চর্চাকেও লালন করতে হবে।

রতন সরকার
শিক্ষা গবেষক ও লেখক
বিআইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

এ কে শেরাম

আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম : আমাদের করণীয়

প্রাককথন:

বাংলাদেশের প্রধান জাতিসত্তা বাঙালি এবং এদেশের প্রধান ভাষা ও একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা। কিন্তু, আমরা জানি, এদেশে বাঙালি ছাড়াও অনেক আদিবাসী জাতিসত্তার বাস–যাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। এই আদিবাসীদের জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা সরকারিভাবে ৪৮টি বলা হলেও পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের মতে এই সংখ্যা কমপক্ষে ৭৫টি এবং তাদের মোট জনসংখ্যা ত্রিশ লক্ষেরও বেশি। এইসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কমপক্ষে ৪৫ টি ভাষা প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী জাতিসত্তা বা তাদের কোনো ভাষার কোনোরূপ সাংবিধানিক বা সরকারি স্বীকৃতি নেই। এইসব ভাষায় সরকারি স্কুল বা বিদ্যায়তনে পাঠলাভের কোনো সুযোগও নেই।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, আজ বাংলা যে এদেশের রাষ্ট্রভাষা এবং প্রধানতম ভাষা এই মর্যাদাও কিন্তু খুব সহজে অর্জিত হয়নি। আমরা জানি, ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির পর পাকিস্তান আমলে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, উনিশ শ' বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে সেই দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যে নিঃসঙ্কোচে প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন অনেক বাঙালি ছাত্র-যুবক; বরকত-সালাম-রফিক-জব্বার-শফিউর–রক্তগোলাপের মতো থোকা থোকা ফুটে ওঠা একগুচ্ছ নাম। আর সেই চরম আত্মদানের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা অর্জন করেছিল তার যোগ্য মর্যাদা, 'একুশে ফেব্রুয়ারি' হয়ে উঠেছিল বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক। আর সে কারণেই 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র এই অমোঘ শক্তি বাঙালির পরবর্তী ইতিহাসের সকল চলমানতার মূল চালিকাশক্তি হয়েছে; জাতির ইতিহাস-সঙ্কটকে নানা ধাপ ও স্তর পেরিয়ে শেষাবধি পৌঁছে দিয়েছে প্রত্যাশার তুঙ্গ শীর্ষে সীমানা–স্বাধীনতার উজ্জ্বল উপত্যকায়। মানব ইতিহাসের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্যে–ধর্মের কারণে আত্মদানের অসংখ্য ঘটনা ঘটলেও মাতৃভাষার জন্যে এই আত্মদান ছিলো ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা। আবেগ-ভালোবাসাকে ছাপিয়ে বাংলার ইতিহাসের এক অনন্য অর্জন হয়ে ওঠা উনিশ শ' বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারির মাতৃভাষার জন্যে আত্মদানের অপরিসীম গৌরবের এই ঘটনা শেষাবধি বাংলা ও বাঙালিকে বিশ্ববলয়ে অভিষিক্ত করেছে এক অক্ষয় মহিমায়–একুশে ফেব্রুয়ারি, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী বাঙালির শহীদ দিবস, ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদে অনুমোদনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে আজ

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এ; যার মূল প্রণোদনা হলো বিশ্বের প্রতিটি ভাষা, যা কোনো-না-কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং তার চর্চা ও বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। এই দায়িত্ব প্রধানত রাষ্ট্র ও সরকারের এবং তার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীয় বলয়ে অবস্থানকারী দেশের প্রধান জনগোষ্ঠীর।

আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম

এই যখন বিশ্ব প্রেক্ষাপট এবং সারা পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠী যখন একুশের চেতনার আলোকে নতুন করে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে নিজ-নিজ মাতৃভাষাকে ভালোবাসার তীব্র আবেগ ও অনুভূতিতে, তখন বাংলাদেশের মূল নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী-বাঙালির পাশাপাশি অবস্থানকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহও নতুন করে উদ্বোধিত হয়েছে একুশের প্রাণিত চেতনার আলোকে। কিন্তু প্রকৃত চিত্র কিছুটা ভিন্ন। এখানে বাঙালির পাশাপাশি বসবাসরত চাকমা, গারো, মারমা, ত্রিপুরা, মণিপুরী, খাসিয়া, সাঁওতাল, রাখাইন, ম্রো, হাজং প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয়ভাবে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত। এই ভাষাগুলোর মধ্যে অনেক ভাষার লিখিত কোনো রূপ নেই, শুধু মৌখিক ভাষা হিসেবে পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বেঁচে আছে এসব ভাষা। আবার অনেক ভাষার লিখিত রূপ থাকলেও যথাযথ চর্চার কোনো সুযোগ নেই। ফলে, এইসব ভাষা ক্রমাগত অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে একসময় ক্রমশ হারিয়ে যেতে পারে বিলুপ্তির অন্ধকারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউনেস্কো বিপন্ন ভাষাগুলোকে 'ভালনারেবল', 'ডেফিনিটলি এণ্ডেঞ্জারড', 'সিভিয়ারলি এন্ডেঞ্জারড' এবং 'ক্রিটিক্যালি এণ্ডেঞ্জারড' এই ৪টি শ্রেণিতে বিভাজন করে দেখিয়েছেন। সম্প্রতি উইকিপিডিয়াতে প্রকাশিত একটি তালিকা অনুযায়ী দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রচলিত আদিবাসী ভাষাগুলোর প্রায় অধিকাংশই বিপন্ন ভাষা হিসেবে ইউনেস্কোর শ্রেণি-বিভাজন অনুযায়ী কোনো না কোনো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আসলে ভাষার বেঁচে থাকার জন্যে লিখিত রূপ থাকা দরকার, দরকার নিয়মিত ও যথাযথ চর্চা এবং বিকাশের ব্যবস্থা। বাংলাদেশে প্রচলিত আদিবাসী ভাষাগুলোর মধ্যে কমপক্ষে ১৬টি ভাষার লিখিত চর্চা আছে, যার মধ্যে অনেক ভাষার আবার রয়েছে সাহিত্যের এক দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য।

আমরা জানি, মণিপুরী ভাষার বয়স প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর এবং লিখিত মণিপুরী সাহিত্যের সূচনাও কমপক্ষে তৃতীয় শতাব্দী থেকে। মণিপুরী ভাষা ভারতের মণিপুর রাজ্যের সরকারি ও রাজ্যভাষা। এই ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশীলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ভাষা হিসেবেও স্বীকৃত। সাঁওতালী বা সান্তাল ভাষাও ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশীলভুক্ত ভাষা। কিন্তু বাংলাদেশে সংখ্যাস্বল্পতা এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগের অভাবে মণিপুরী ভাষাও আজ প্রায় বিপন্নের পর্যায়ে। বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ভাষাগুলোর মধ্যে কমপক্ষে ৬টি ভাষার রয়েছে নিজস্ব লিপিপদ্ধতি বা বর্ণমালা। এই ভাষাগুলো হলো: চাকমা, মণিপুরী, মারমা, সান্তাল, রাখাইন ও ম্রো। কিন্তু বাংলাদেশে এইসব ভাষার কোনোটিরই প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা বা সরকারি স্কুল বা বিদ্যায়তনে পাঠ-মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ নেই। ফলে, এইসব ভাষার অনেকগুলোই হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কার মধ্যে নিপতিত।

তাছাড়া, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ না পাওয়ায় ভাষাগত জটিলতার কারণে অনেক আদিবাসী শিশু শিক্ষাঙ্গন থেকে শিক্ষাজীবনের প্রথম পর্যায়েই ঝরে যাচ্ছে, আর এর ফলে আদিবাসী শিশুদের মেধাবিকাশও বিঘ্নিত হচ্ছে। আর এ কারণেই, নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ বা নিজের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার অধিকার আজ আন্তর্জাতিকভাবে এক ধরনের মৌলিক অধিকার বা মানবাধিকার হিসেবেই স্বীকৃত এবং বিষয়টি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সাথেও জড়িত।

এরকম এক প্রেক্ষাপটে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের দাবি ও প্রত্যাশার অনুকূলে ২০১০ সালে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতিতে দেশের এইসব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেন। দেশের সর্বস্তরের আদিবাসী জনগোষ্ঠী সরকারের এই মহতী উদ্যোগে প্রাণিত বোধ করে, আশাবাদের উজ্জ্বল আলোকধারায় স্নাত হয় তারা। ২০১১ সাল থেকে এতদসংক্রান্ত পদক্ষেপ গৃহীত হওয়ার পর ২০১২ সালে একটি জাতীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে আদিবাসী শিশুদের নিজ-নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রথম পর্যায়ে ৬টি ভাষা নির্বাচিত হয় এবং এই সব ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান কর্মসূচি শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়। এই ৬টি ভাষা হলো– চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা বা ককবরক, গারো, সাদরী ও সান্তাল। কিন্তু লিপি বিষয়ক জটিলতার কারণে সান্তাল ভাষা পরবর্তীতে বাদ পড়ে যায় এবং বাকি ৫টি ভাষা নিয়ে কাজ এগিয়ে চলে। কিন্তু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারের শ্লথগতি ও নানা অপ্রত্যাশিত দীর্ঘসূত্রতার কারণে বহুল প্রত্যাশিত সে কর্মসূচি এখনও কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

বলা হয়েছিল, প্রথম পর্যায়ের নির্বাচিত ভাষাগুলোর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভাষাগুলোকেও এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। আর তাই দেশের অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীও আশায় আশায়

দিন গুনছিল কখন তাদের নিজেদের মাতৃভাষাও সরকারিভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান কর্মসূচির আওতায় আসবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখন পর্যন্ত ঐ ৫টি ভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু হয়নি। কবে নাগাদ শুরু হবে এ বিষয়েও কেউ নিশ্চিত নয়। এই অবস্থায় প্রবল আশাবাদিতার উজ্জ্বল আলোয় অবগাহন করা বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা, সঙ্গত কারণেই, আবার নিমজ্জিত আজ হতাশা ও নৈরাশ্যের অমা-অন্ধকারে।

প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিশেষত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যের ভাষা-পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় নিতে পারি। সেখানে সরকারি রাজ্যভাষা ছাড়াও রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত বেশ ক'টি ভাষাকেও এক ধরনের সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে ঐ সব ভাষার উন্নয়নে কার্যকর সরকারি ভূমিকা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ত্রিপুরার রাজ্যভাষা বাংলা। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার আরো কমপক্ষে ৫টি ভাষা– ককবরক, মণিপুরী, চাকমা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী এবং হালাম-কুকিকেও সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে ঐ ভাষাগুলোর উন্নয়নে কাজ করার জন্যে পৃথক একটি ডাইরেক্টরেট গঠন করেছে। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের অনেক আগে থেকেই তারা এই দিনটিকে 'ভাষা দিবস' শিরোনামে পালন করে আসছে, যেখানে তারা সকল সরকারি অনুষ্ঠানমালায় বাংলার পাশাপাশি এসব ভাষাকে সম্পৃক্ত করতো। তাছাড়া সরকারিভাবে ঐসব ভাষায় স্কুল পর্যায়ের শিক্ষালাভের সুযোগ দানের পাশাপাশি নিয়মিত সাহিত্যের প্রকাশনাও করে থাকে।

সরকারিভাবে আয়োজিত বইমেলায় ঐ ভাষাগুলোর জন্য বিনা মূল্যে পৃথক স্টলের ব্যবস্থা করা হয় এবং নিজ-নিজ ভাষায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ঐসব ভাষাভাষী লেখক-সাহিত্যিকদের 'ভাষা সম্মান' দিয়ে সম্মানিত করা হয়ে থাকে। রাজ্যের ক্ষুদ্র ভাষার উন্নয়নে ত্রিপুরা সরকারের এ-জাতীয় উদ্যোগ সকলের জন্য নিঃসন্দেহে অনুকরণীয় বলে বিবেচিত হতে পারে।

সিলেটে আদিবাসীদের ভাষাচিত্র

জাতীয় পর্যায়ে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের এই চিত্রের পাশাপাশি আমরা যদি সিলেট অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষাচিত্র একটু পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখা যাবে তা আরো নৈরাশ্যব্যঞ্জক। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মণিপুরী, খাসি, পাত্র, গারো, হাজং, উরাং (ওঁরাও), মাল (মালো) এবং বিভিন্ন চা শ্রমিক জনগোষ্ঠী। চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার বিভিন্ন জাতিসত্তা রয়েছে। ভাষাভিত্তিক বিভাজনে অনেকে চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে ৬টি ভাষিক জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত করে থাকেন। এই ৬টি ভাষা হলো– উড়িয়া, ভূজপুরী (দেশোয়ালী), সাদরী, তেলেগু, সানতালী বা সান্তাল ও বাংলী। (বাড়াইক, পরিমল সিং : চা-জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি: ২০০৯ : ১৫-১৬)। সরকারিভাবে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে যে ৬টি ভাষাকে নির্বাচন করা হয়েছে এগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের কোনো ভাষা নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারিভাবে না হলেও পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করে আদিবাসীদের ভাষাচর্চার নানারকম উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। উত্তরবঙ্গেও এ-ধরনের কিছু কিছু উদ্যোগ সাধারণভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু সিলেটে কোনো বেসরকারি সংস্থাই এ-ধরনের কোনো উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসেননি। তবে সিলেটের ভাষাগুলোর মধ্যে মণিপুরী, খাসি ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার ক্ষেত্রে নিজেদের উদ্যোগে সাহিত্য সংগঠন তৈরী করে লিখিতভাবে নিয়মিত সাহিত্যচর্চার এক সচেতন প্রয়াস লক্ষ করি।

মণিপুরী ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে। কিন্তু প্রায় দুই হাজার বৎসরের পুরোনো এই লিপি একসময় নানা কারণে বাংলা বর্ণমালা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। সেই থেকে গত কয়েক শ' বছর যাবত মণিপুরী ভাষা বাংলা লিপিতে লিখিত হচ্ছে। তবে এই মূল মণিপুরী লিপি একেবারে হারিয়ে যায়নি; মণিপুর রাজ্যে, খুব সীমিত পরিসরে হলেও, অব্যাহত ছিল এর প্রচলন। ২০০৫ সালে মণিপুর রাজ্যে মণিপুরী লিপিতে রচিত পাঠ্যপুস্তক দিয়ে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু হয় এবং ইতোমধ্যে এই কার্যক্রম কলেজ পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। আগামীতে মণিপুরে মণিপুরী লিপি পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে এবং বাংলা লিপির ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর সেকারণেই মণিপুরী ভাষার মূল স্রোতোধারার সাথে অবিচ্ছিন্ন এক সম্পর্ক রাখার স্বার্থে বাংলাদেশেও 'মণিপুরী ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা' একান্তই নিজেদের উদ্যোগে নূতন প্রজন্মের মণিপুরী শিক্ষার্থীদেরকে মণিপুরী লিপি ও ভাষা শেখানোর লক্ষ্যে মণিপুরী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে ৭টি মণিপুরী স্কুল স্থাপন করেছে, যেখানে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরবর্তী কালে একটি বেসরকারী সংস্থা 'এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ওর্গেনাইজেশন (একডো)' দাতা সংস্থার সহায়তায় মণিপুরী লিপি ও ভাষা শিক্ষার ৩টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নিয়মিত পরিচালনা করছে। অন্যান্য ভাষাগুলো শুধুমাত্র মৌখিক ভাষা হিসেবে প্রচলিত থাকায় প্রয়োজনীয় পরিচর্যার অভাবে দ্রুত হারিয়ে যেতে পারে বলে

আশঙ্কা প্রকাশ করছেন অনেকেই।

মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম–আমাদের করণীয়

বাংলাদেশে আদিবাসীর সংখ্যা নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে, তেমনি তাদের মাতৃভাষার প্রকৃত চিত্রও অস্পষ্ট। এদেশে এরকম কয়টি ভাষা প্রচলিত আছে, ভাষাগুলোর আদি উৎস, বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ, ভাষাভাষীর সংখ্যা নির্ধারণ, প্রতিটি ভাষার ভাষা-এলাকা চিহ্নিত করা; এরকম প্রাথমিক অনেক কাজই করার আছে এবং এই কাজগুলো আগে সম্পন্ন করতে হবে অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে ও গুরুত্বের সাথে। এই কাজটি করতে হবে একটি অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত দল গঠন পূর্বক মাঠ গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে।

আমরা জানি, বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষাগুলোর মধ্যে অধিকাংশেরই লেখ্যরূপ নেই, শুধুমাত্র মৌখিক ভাষা হিসেবে টিকে আছে। এগুলোর মধ্যে আবার অনেক ভাষা নিশ্চিতভাবে বা চরমভাবে বিপন্ন। এইসব ভাষার নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চর্চার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ খুবই জরুরি। আবার অনেক ভাষার লেখ্যরূপ থাকলেও নিজস্ব লিপি নেই। এসব ভাষা বাংলা বা রোমান হরফে লিখিত হচ্ছে। প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব লিপি থাকতেই হবে এরকম কোনো কথা নেই। আমরা জানি, পৃথিবীতে অনেক ভাষা নিজস্ব লিপি ছাড়াই ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে। তবে যাদের নিজস্ব লিপি-পদ্ধতি আছে, তারা নিশ্চয়ই আবেগ-ভালোবাসার জায়গা থেকে এক অন্যরকম উচ্চতায় আছে।

আমাদের দেশে অনেক আদিবাসী ভাষা নিজস্ব লিপি-পদ্ধতি আবিষ্কারের পর্যায়ে আছে। সেইসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শের মাধ্যমে লিপি নির্ধারণ এবং প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা করতে হবে। বাংলাদেশের ভাষা-প্রসেনিয়ামে নিতান্ত অবহেলায় পার্শ্বপর্দার অন্তরালে পড়ে থাকা উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও বিপন্ন ভাষাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা ও বিকাশের ক্ষেত্রে সরকার এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে পালন করতে হবে সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদেরও রয়েছে এক অনুপেক্ষণীয় দায়িত্ব। রাষ্ট্র বা সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে তাদের নিজেদেরকেও উদ্যোগী হতে হবে এবং যে কোনো মহল থেকে গৃহীত এরকম উদ্যোগে প্রসারিত করতে হবে আন্তরিক সহযোগিতার প্রত্যয়ী হাত। নিচে এতদসংক্রান্ত করণীয় প্রসঙ্গে কিছু বিষয় সুপারিশ ও পরামর্শ আকারে উপস্থাপন করছি।

১. একটি অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে সারা দেশের আদিবাসীদের সম্পূর্ণ একটি ভাষা-চিত্র তৈরী করা।

২. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের আওতায় সকল আদিবাসী শিশুকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। এজন্যে যেসব ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে তাদের ক্ষেত্রে সেই বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা, যাদের লিপি নেই তাদের জন্যে প্রচলিত বা তাদের পছন্দের লিপিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা। আর যাদের এখনও লেখ্যরূপ নেই, তাদের জন্য দ্রুত লেখ্যরূপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ।

৩. সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ভাষার অভিধান প্রণয়ন করা। সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাষার জন্য পৃথক অভিধান প্রণয়ন না করে একই ভাষাপরিবারভুক্ত কয়েকটি ভাষা মিলে এক-একটি অভিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে। এতে করে এইসব ভাষার আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্রটিও বিস্তৃত হবে।

৪. যে সমস্ত আদিবাসী এলাকায় পর্যাপ্ত স্কুল নেই, সেখানে স্কুল স্থাপন এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী এলাকায় পদায়ন করা।

৫. আদিবাসীদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও বিকাশে আরো নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পৃথক একটি বিভাগ গঠন করা।

৬. যে সব ভাষার লিখিত রূপ আছে এবং নিয়মিত সাহিত্য চর্চা হচ্ছে, তাদের সকল কর্মকাণ্ডকে সহায়তা ও উৎসাহিত করার জন্যে সেইসব ভাষার সাহিত্য কর্মের প্রকাশনার ব্যবস্থা করা, জাতীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালায় এইসব ভাষা ও সাহিত্যকে সম্পৃক্ত করা এবং জাতীয়ভাবে বিভিন্ন পুরস্কার ইত্যাদি প্রবর্তন করে এইসব সাহিত্য-সৃষ্টিকে উৎসাহিত করা।

৭. এরকম সকল কাজে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের সম্পৃক্ত করা।

আমরা আশা করি, সকলের সম্মিলিত উদ্যোগেই 'একুশে ফেব্রুয়ারি' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর উদগাতা এই বাংলাদেশে প্রচলিত ছোট বড় সকল ভাষা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও সৌন্দর্য নিয়ে যথাযথ মর্যাদায় বেঁচে থাকবে এবং ক্রমশ বিকশিত হবে।

এ কে শেরাম

সভাপতি, মণিপুরী ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা, সিলেট

(সিলেট জেলায় মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক সেমিনারে পঠিত।)

বিশেষ প্রতিবেদন

গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে
একুশে শিক্ষা মেলা ২০১৬

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে অভিযান তার নিজস্ব প্রকাশনাসহ সদস্য/সহযোগী সংস্থা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রকাশিত শিক্ষা, উন্নয়ন ও পরিবেশ বিষয়ক নানাবিধ উপকরণ (বই, চার্ট, পোস্টার, ফ্লিপচার্ট, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি) প্রদর্শন ও বিস্তরণ করে থাকে। যার অংশ হিসেবে ১৯৯২ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থ মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলা একাডেমীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানে কেবলমাত্র প্রকাশনা সংস্থাগুলো অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে গত দুই বছর ধরে গণসাক্ষরতা অভিযান বাংলা একাডেমীর গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ না পেয়ে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় 'শিক্ষা মেলা' আয়োজন করে আসছে।

এবছরও বই মেলায় বাংলা একাডেমীর পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণসাক্ষরতা অভিযান অংশগ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় গাইবান্ধা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় 'শিক্ষা মেলা'-র আয়োজন করে।

শিক্ষামেলা আয়োজনের উদ্দেশ্য

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ তৈরি করা;
- এই শিক্ষা মেলার মাধ্যমে সবার মধ্যে একুশের চেতনা ও এর তাৎপর্য তুলে ধরা;
- শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ে তৈরি বই ও বিভিন্ন প্রকাশনা সম্পর্কে মেলায় আগত দর্শক-শ্রোতাদের অবহিত করা;
- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিস্তরণ করা;
- 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা'-র দাবি জোরালো ভাবে তুলে ধরা ;
- শিক্ষা মেলায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা'-র অধিকার আদায়ে সহায়ক নীতিপরিবেশ তৈরির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা।

গাইবান্ধা

মহান একুশে উপলক্ষে ২৭-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সহযোগী সংগঠন এসকেএস ফাউন্ডেশন ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে গাইবান্ধা জেলার পৌর শহীদ মিনার চত্বরে শিক্ষা মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় জেলার ১০টি সংগঠন অংশগ্রহণ করে।

২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে মেলার উদ্বোধন করা হয় এবং একই দিনে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এইদিন প্রদর্শিত হয় একুশের চেতনাভিত্তিক নাটক 'ক্ষ্যাপা পাগলার প্যাঁচাল'; মঞ্চস্থ করে গাইবান্ধার ঐতিহ্যবাহী নাট্য সংগঠন মেঘদূত নাট্যগোষ্ঠী।

২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়; বিষয় ছিল: 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালত সহ সর্বত্রই বাংলাভাষার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ'।

এরপর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর পরিবেশনায় একুশে ফেব্রুয়ারি ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করা হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে চিত্রাংকন ও বির্তক প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ, পুরস্কার বিতরণ ও মেলার সমাপনী ঘোষণা করা হয়।

কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় সাদ বাংলাদেশ এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত শিক্ষা মেলার আয়োজন করা হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি মেলার উদ্বোধন করা হয়। এইদিন স্কুল পর্যায়ে সাধারণ জ্ঞান, শুদ্ধ বাংলা বানান প্রতিযোগিতা, কলেজ পর্যায়ে উপস্থিত বক্তৃতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে স্কুল পর্যায়ে চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কাজী আশিক এলাহী

সহকারী কার্যক্রম কর্মকর্তা

বিশেষ প্রতিবেদন

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মশালা

গণসাক্ষরতা অভিযান "সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের ৫টি পর্ব সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে এবং এ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৭টি বিভাগে অভিযানের সদস্য সংগঠনের নিয়ে ৭টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালাগুলোর সুপারিশসমূহ নিয়ে অভিযানের ষষ্ঠ পর্বের (এপ্রিল ২০১২-মার্চ ২০১৭)-এর জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে।

এই পরিকল্পনার খসড়া তৈরির লক্ষ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত গাইবান্ধার জেলার এসকেএস-ইন-এ একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অভিযান পরিচালক তাসনীম আত্হার, উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ, উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক, উপ-পরিচালক তৌফিক হোসেন চৌধুরী, কার্যক্রম ব্যবস্থাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ব্যবস্থাপক প্রদীপ কুমার সেন ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ মোট ৪২ জন অংশগ্রহণ করেন। অভিযানের কর্মীরা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে SOWT Analysis করেন, যার মাধ্যমে এই সংগঠনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

যেসব সবলতার দিক চিহ্নিত করা হয় তা হল:

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং; সরকার ও ডেভেলপমেন্ট পার্টনার, স্থানীয় পার্টনারদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে সফল এডভোকেসীর মাধ্যমে সরকারি ও অন্যান্য অংশীজনদের নিকট অভিযানের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা; সরকারের শিক্ষা সংশিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্যভুক্তি; মিডিয়ার সাথে সুসম্পর্ক; *এডুকেশন ওয়াচ* রিপোর্টের দেশ ও বিদেশে সমাদর বৃদ্ধি; অভিযানের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পলিসি উন্নয়ন; আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা; অভিযানের উপকরণ উন্নয়ন; দক্ষ সদস্য নির্বাচন এবং অভিযানের নির্বাহী পরিচালকের গতিশীল নেতৃত্ব।

দুর্বল দিক হিসেবে কর্মীরা যা শনাক্ত করেন:

যথাযথ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ সমন্বয়, দীর্ঘ মেয়দী কর্মসূচি গ্রহণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি বেইস কার্যক্রম গ্রহণের দুর্বলতা; এমআইএস সিস্টেম ও সদস্যভুক্তি ব্যবস্থাপনায় সমস্যা।

ভবিষ্যতে যেসব বিষয়ে কাজের সুযোগ রয়েছে সে বিষয়ে কর্মীরা কিছু এলাকার কথা উল্লেখ করেন। সেগুলি হল:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা; মাদ্রাসা শিক্ষা; MLE ও কারিগরী ও ভোকেশনাল শিক্ষা; একীভূত শিক্ষা; আইসিটি শিক্ষা; ৩য় লিঙ্গের শিক্ষা; জীবনব্যাপী শিক্ষা; শিক্ষকদের পেশাগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি; বড় ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি; প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশবকালীন যত্ন শিক্ষা; জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০; বাল্য বিবাহ রোধ; পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা; যুব ও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা; এসডিজি লক্ষ্য-৪ এবং এডুকেশন ২০৩০।

এছাড়া দাতা সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা; এনজিওদের ওপর সরকারের বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ; বৈশ্বিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট হ্রাস; দাতা সংস্থার পলিসি; মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বৈদেশিক ফান্ডের সম্ভাব্য অপ্রতুলতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

কৌশলগত পরিকল্পনার ২য় দিনে অভিযান কর্মীরা গাইবান্ধার জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শিবরাম আর্দশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি পাঠদানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, বাংলাদেশের ইতিহাসকে জানার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস জাদুঘর প্রভৃতি এই বিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩য় দিনে ৪টি দলে ভাগ হয়ে কর্মীরা কৌশলগত পরিকল্পনার Right based approach to Education, CAMPE Mission, Vision and Core Values নিয়ে কাজ করে। কর্মশালায় Core Values of CAMPE ও অভিযানের একটি কার্যকরী পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

জয়া সরকার
সহকারী কার্যক্রম কর্মকর্তা

মসজিদভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্প অব্যাহত রাখতে আরও ৮৩ কোটি টাকা প্রয়োজন

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প অব্যাহত রাখতে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) আরও ৮৩ কোটি ৬৯ লাখ ৪৩ হাজার টাকা চেয়েছেন ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান। বিষয়টি অবগত করে এরই মধ্যে তিনি পরিকল্পনামন্ত্রী আহম মুস্তফা কামালকে চিঠি দিয়েছেন বলে পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

অর্থমন্ত্রী চিঠিতে উল্লেখ করেন, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-ষষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি এক হাজার ৫৫০ কোটি ৯৩ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ৬৪ জেলার সব উপজেলায় ৫১ হাজার ৫৬৮টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬ লাখ ৫৭ হাজার ২০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হবে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের চাহিদা ছিল ২৬৮ কোটি ৬৯ লাখ ৪৩ হাজার টাকা।

কিন্তু বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেওয়া হয় ১৮৫ কোটি টাকা। অথচ শুধু প্রকল্পে কর্মরত জনবলের বেতন-ভাতাদি, শিক্ষক ও কেয়ারটেকারের সম্মানী ভাতা, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও মুদ্রণসহ শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান বাবদই প্রয়োজন ২৩৯ কোটি ৫৯ লাখ ৪৯ হাজার টাকা।

আমাদের সময় ০২.০২.২০১৬

এসডিজি অর্জনে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে হবে: স্পিকার

জাতীয় সংসদের স্পিকার ও সিপিএ নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, দক্ষিণ এশীয় স্পিকারস ফোরামকে শক্তিশালী করতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে সবাইকে নিজ নিজ অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

গতকাল সোমবার সংসদ ভবনে তার কার্যালয়ে সফররত ভুটানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার লিয়নপো জিগমে জেংপোর নেতৃত্বে চার সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করতে গেলে স্পিকার এ কথা বলেন। শিরীন শারমীন চৌধুরী প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'এসডিজি বাস্তবায়নে ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ) আমাদের সহযোগিতা করবে, কিন্তু মূল কাজটি আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত পেমা সোডেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল ০২.০২.২০১৬

প্রাথমিকের ২৭ শতাংশ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২৭ শতাংশ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই, যা সংখ্যায় ৮৫ হাজার ৯১৫। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক জরিপে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশনের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্ধেকের বেশি শিক্ষক কার্যকরভাবে সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেন না। ফলে প্রাথমিকে গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে না। অনেক শিশু ভালোভাবে না শিখেই ওপরের শ্রেণিতে উঠছে।

প্রাথমিক শিক্ষার এরকম পরিস্থিতিতে 'মানসম্মত শিক্ষা, জাতির প্রতিজ্ঞা' স্লোগান নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সারা দেশে শুরু হচ্ছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। শেষ হবে ১০ ফেব্রুয়ারি। আজ সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সপ্তাহের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ইউনেসকোর প্রতিবেদনে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০১৪ এবং একাধিক গবেষণা প্রতিবেদনসহ প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও শিক্ষকদের বিষয়ে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

ইউনেসকোর সহযোগিতায় করা 'সবার জন্য শিক্ষা' জাতীয় পর্যালোচনা, বাংলাদেশ-২০১৫ প্রতিবেদনে বলা হয়, শিখন-শেখানোর প্রক্রিয়ার কারণে অনেক শিক্ষার্থী 'নীরবে বাদ পড়ছে'। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক মো. ছিদ্দিকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, গুণগত শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যোগ্য শিক্ষক। এজন্য স্বচ্ছ নিয়োগ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। নিয়োগের পর সব শিক্ষককে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

প্রশিকক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা ঠিকমতো পাঠদান করাচ্ছেন কি না, সেটা দেখার জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে যথাযথ সহায়তা করার ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এত দিন প্রাথমিক শিক্ষকদের এক বছর মেয়াদি (কার্যত নয় মাস) সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিইনএড) কোর্সের নামে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও এখন এই কোর্সকে ডিপ্লোমা ইন প্রাথমিক শিক্ষা করা হয়েছে। মেয়াদ দেড় বছর।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের, মহাপরিচালক মো. আলমগীর বলেন, যে সুযোগ রয়েছে, তাতে তাড়াতাড়ি সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য এখন চিন্তাভাবনা চলছে, যাদের এই ডিপ্লোমা কোর্স থাকবে, তাদের ভবিষ্যতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে।

প্রথম আলো ০৪.০২.২০১৬

ঝরে পড়ার শঙ্কায় চা বাগানের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী

প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ঝরেপড়ার শঙ্কায় কয়েক হাজার শিক্ষার্থী। আসন সংখ্যার দ্বিগুণ ভর্তি করা হলেও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাবে না আরও তিন হাজার। ২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রায় তিন হাজার শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তির অপেক্ষায় ৯ হাজার ৬৬ জন। যার অধিকাংশ চা বাগান শ্রমিকদের সন্তান। আর এ ঝরেপড়ার তালিকায় বরাবরই থাকছে কমলগঞ্জের ১৩ টি চা বাগানের শ্রমিকদের ছেলেমেয়ে।

কমলগঞ্জ পাত্রখলা বাগান ও এর আশেপাশের এলাকায় নেই কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়। দরিদ্র চা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েই ঝরে পড়ছে। বাগান থেকে স্কুলের দূরত্ব বেশি হওয়ায় ও অনিয়মিত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে দরিদ্র বাবা-মায়ের পক্ষে সম্ভব হয় না সন্তানের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া। এ চিত্র কমলগঞ্জ উপজেলার প্রত্যেকটি চা বাগানেই। সমস্যায় ভুগছেন কমলগঞ্জের মনিপুরী কমিউনিটির শিক্ষার্থীরাও।

কমলগঞ্জ বহুমুখী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রণেন্দ্র দেব বলেন, শিক্ষার্থীর বাড়তি চাপ সামাল দিতে কয়েকটি শাখা তৈরি করতে হয়েছে। পড়াশোনা থেকে যাতে কোমলমতি শিশুরা ঝরে না পড়ে, সে জন্য বাড়তি চাপ নিতে হচ্ছে তাদের। আসন সংখ্যার অধিক হারে ভর্তি করে ভালো করে ক্লাস নিতে পারছেন না শিক্ষকরা। তবে কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম এ বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি শিক্ষানুরাগী ও চা বাগান মালিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কারণ কমলগঞ্জ উপজেলায় বেশ কয়েকটা চা বাগান রয়েছে। সেখান থেকে অনেক শিক্ষার্থীই স্কুলে আসতে পারে না। কমলগঞ্জের প্রায়

তিন হাজার ছাত্রের ঝরেপড়া রোধে চা বাগান এলাকায় হাইস্কুল স্থাপনে দ্রুত এগিয়ে আসবেন বাগান মালিকরা, এমনটিই চাওয়া শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক শিশুদের।

মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গত বছর প্রায় ছয় হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল খুব কষ্ট করে। প্রত্যেকটি স্কুলে একাধিক শাখা নিয়ে ক্লাস নিতে হচ্ছে। আর এ বছর ৯ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা খুবই জটিল বিষয়। তাই যদি নতুন স্কুল স্থাপন করা না হয়, তাহলে অনেক ছেলেমেয়েই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

আমাদের সময় ০৭.০২.২০১৬

হাওরাঞ্চলে প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার ৩০%

দেশের সমতলভূমিতে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ২০ শতাংশের মধ্যে থাকলেও হাওরাঞ্চলে তা ৩০ শতাংশের বেশি। এমনকি হাওরাঞ্চলে ভর্তির হার সমতলভূমির তুলনায় অনেক কম। প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলছেন, হাওরাঞ্চলে প্রাথমিকে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্কুলে ঝরে পড়ার হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হলে সেখানে মনোযোগ দিতে হবে আলাদাভাবে। হাওরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য নৌকায় স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। পাশাপাশি স্কুলে শিক্ষকদের ধরে রাখার জন্য বাড়তি প্রণোদনা দিতে হবে এবং শুষ্ক মৌসুমে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের আহারের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

জানা যায়, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা-এই সাত জেলা নিয়ে বৈচিত্র্যময় হাওরাঞ্চল গঠিত। হাওরাঞ্চলে মোট সংসদীয় আসন ৩৬টি। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের হিসাবে, এ সাত জেলায় হাওর আছে ৩৭৩টি। জাতীয়ভাবে যেখানে দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশের নিচে, হাওরাঞ্চলে এ হার ২৮ শতাংশের ওপরে। হাওরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার হার অত্যন্ত করুণ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, হাওরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার সবচেয়ে বেশি। দেশে গড়ে যেখানে ঝরে পড়ার হার ২০ শতাংশের মতো, সেখানে হাওরাঞ্চলে ৩০ শতাংশের ওপরে। ঝরে পড়ার হার সুনামগঞ্জে সবচেয়ে বেশি ৩৬ শতাংশ।

হাওর অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হাওরাঞ্চলের উন্নয়নে মানুষের জীবিকায়ন, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কোনো প্রকল্প নেওয়া হয়নি।

সংস্থাটির মহাপরিচালক কালের কণ্ঠকে বলেন, হাওর উন্নয়নে প্রণয়ন করা হয়েছে ২০ বছর মেয়াদি একটি মহাপরিকল্পনা। এতে সাত জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি, যোগাযোগ, কর্মসংস্থানসহ সব খাতের উন্নয়নের জন্য ১৫৪টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ২৮ হাজার কোটি টাকা। ১৭টি মন্ত্রণালয় ও ৩৮টি বিভাগ এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে বলে জানান তিনি।

কালের কণ্ঠ ০৮.০২.২০১৬

দৃষ্টিহীনদের বিনামূল্যে বই বিতরণের নিবন্ধন চলছে

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় দৃষ্টিহীনদের জন্য বিনামূল্যে ব্রেইল পদ্ধতির বই বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে স্পর্শ প্রকাশনী। ২২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা উৎসবে দৃষ্টিহীনদের মধ্যে বই বিতরণ করা হবে। এজন্য বাংলা একাডেমি চত্বরে ৮৩-৮৪ নম্বর প্যাভিলিয়নে গিয়ে নিবন্ধন করতে হবে দৃষ্টিহীনদের। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৩২ জন দৃষ্টিহীন নিবন্ধন করেছেন বলে জানা গেছে।

স্পর্শ প্রকাশনীর কর্ণধার নাজিয়া জাবিন বলেন, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্পর্শ প্রকাশনী ২০০৯ সাল থেকে দৃষ্টিহীনদের ব্রেইল পদ্ধতির বই বিতরণ করে আসছে। ২০১১ সাল থেক গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করে স্পর্শ প্রকাশনী। তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী রয়েছেন। তারা হলেন নাজমুল হাসান এবং নাইম আহমেদ। এছাড়া আরও ৩১ জন নিবন্ধন করেছেন। এ পর্যন্ত ব্রেইল পদ্ধতির মোট ৩৭টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

আলোকিত বাংলাদেশ ০৯.০২.২০১৬

৪০ ভাগ মানুষ নিজ ভাষায় পড়ার সুযোগ পায় না: ইউনেসকো প্রতিবেদন

বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ নিজ ভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ পায় না। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো গতকাল শুক্রবার এক বৈশ্বিক প্রতিবেদনে একথা জানিয়েছে। এতে জোর দিয়ে বলা হয়, শিশুরা বুঝতে পারে–এমন ভাষায় তাদের পড়তে দেয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং (জিইএম) রিপোর্টটিতে লেখা হয়েছে: 'যদি বুঝতেই না পারেন, শিখবেন কীভাবে?' এতে যুক্তি দেখানো হয়, নিজ ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষায় পড়ানো হলে শিশুদের শিক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, বিশেষত দারিদ্রপীড়িত শিশুরা এর শিকার হয়।

ইউনেসকোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা শিশুদের নিজ ভাষায় পড়তে দেওয়ার মৌলিক নীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, বৈশ্বিক শিক্ষার নতুন লক্ষ্য: সবার জন্য গুণগত মান, সমতা এবং জীবনব্যাপী শেখার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য মাতৃভাষায় পাঠদান এবং শেখার বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া এবং ভাষাবৈচিত্র্য রক্ষা করা অপরিহার্য। সব ভাষার অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার নীতি বাস্তবায়ন হলে উচ্চহার অর্জনের পাশাপাশি সহনশীলতা, সামাজিক সংযোগ এবং শান্তি বজায় থাকবে।

একাধিক ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর কয়েকটি দেশে শিক্ষার পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। গুয়েতেমালায় ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে দুই ভাষায় পড়তে পারে। সেখানে তাদের একই শ্রেণীতে একাধিকবার পড়া এবং ঝরে পড়ার হার কমেছে। আবার তারা সব বিষয়েই ভালো নম্বর তুলতে পারছে। ইথিওপিয়ায় দুই ভাষায় পড়ার সুযোগ পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা গত আট বছরে উন্নতি করেছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বহু নৃগোষ্ঠীর দেশ তুরস্ক, নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও গুয়েতেমালার মতো দেশগুলোতে বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রভাবশালী একটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অসমতার মতো বৃহত্তর বিষয়ে জনমনে ক্ষোভ রয়েছে। ইউনেসকোর জিইএম রিপোর্টের পরিচালক অ্যারন বেনাভোট বলেন, ভাষা উভয় প্রান্তে ধারযুক্ত তলোয়ারের মতো কাজ করে। এটি সামাজিক বন্ধন এবং অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে নৃগোষ্ঠীগুলোর চেতনাকে দৃঢ় করে। আবার এটি তাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার ভিত্তিও হতে পারে। শিক্ষানীতি অবশ্যই এমন হওয়া উচিত যাতে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীসহ সব শিক্ষার্থী নিজেদের ভাষায় বিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ পায়।

প্রথম আলো ২০.০২.১৬

কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক কর্মশালা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার প্রদত্ত সেবার মান নিম্নরূপ ও তা উন্নয়নের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান কমিউনিটি স্কোর কার্ড করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় পরিচালিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় বিদ্যালয় ভিত্তিক এই স্কোর কার্ড কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

এই কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ৩০-৩১ জানুয়ারি, ২০১৬ গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর সহযোগী সংগঠন সেরা এর যৌথ উদ্যোগে গারো কনভেনশন সেন্টার হলরুম, বিরিশিরি, দুর্গাপুর, নেত্রকোনায় মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক এক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় ৪টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর সমন্বয়কারী সংস্থার প্রতিনিধি ও অভিযান কর্মীসহ মোট ২০ জন অংশ নেয়। কর্মশালার প্রথম দিন কমিউনিটি স্কোর কার্ড সম্পর্কে ধারণা প্রদান হয় ও ২য় দিন স্থানীয় নওয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড করার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের এ সম্পর্কে হাতে-কলমে শেখানো হয়েছে। ওরিয়েন্টেশনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উন্নয়নকর্মী মো. এনায়েত উল্লাহ তালুকদার।

কাজী আশিক এলাহী

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শিক্ষার মূলধারায় প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান সিডিডি'র সহযোগিতায় সাভারে সিডিডি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ 'প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ' বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মোট ১৫ জন শিক্ষক অংশ নেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

এই কর্মশালায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার পরিচিতি ও প্রাথমিক সনাক্তকরণ, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ উপযোগীকরণ ও ব্যবস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষে যোগাযোগ করার কৌশল, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী শিক্ষাদান কৌশল, শিক্ষা উপকরণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি নির্বাচন, একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে শিক্ষকের করণীয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ ও নীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সান্ত্বনা আইউব

শিক্ষা ২০৩০ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ গণসাক্ষরতা অভিযান ও দেবী চৌধুরানী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র-এর যৌথ উদ্যোগে রংপুর জেলায় এনজিও ফোরাম এর সম্মেলন কক্ষে শিক্ষা ২০৩০ ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুলতানা পারভিন, এডিসি, রংপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জিয়াউর রহমান, জেলা নির্বাহী অফিসার, রংপুর সদর। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আফরোজা জেসমিন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, নুরেস কাউসার বানু, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সহকারি পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব নুরুল ইসলাম দুলু, নির্বাহী পরিচালক, দেবী চৌধুরানী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র।

মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্য

- সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে আলোকপাত ;
- এডুকেশন ২০৩০ সর্ম্পকিত তথ্য ও উপাত্ত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অংশীজনদের কাছে উপস্থাপন করা এবং এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় সর্ম্পকে মতামত/সুপারিশ সংগ্রহ;
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে এ্যাডভোকেসি।

মুক্ত আলোচনায় যে সমস্ত বিষয়সমূহের প্রতি জোর দেয়া হয় তা নিম্নে দেয়া হল:

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য- ৪ এর বিষয়টি নিয়ে সর্বত্র ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা:
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্নয়ে লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি Plan of action তৈরি করা;
- শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধি;
- কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেয়া;
- বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কর্মঘন্টা বৃদ্ধি;
- ফলাফল নয় শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতার প্রতি জোর দেয়া।

সভায় বিভিন্ন কলেজ, বিদ্যালয় ও মাদ্রসার শিক্ষকবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এস.এম.সি সদস্য, ইমাম, অভিভাবক, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, অন্যান্য পেশাজীবী

এবং স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিনিধিসহ মোট ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সামছুন নাহার বেগম কলি

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

গণসাক্ষরতা অভিযান ৮ - ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত 'কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণে দিনাজপুর, পঞ্চগড়, রাজশাহী, সাভার ও ঢাকা জেলার নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ২৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল শিক্ষার ধারণা ও মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান প্রেক্ষাপট, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর অঙ্গীকারসমূহ, কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষার ধারণা ও শিক্ষকের করণীয়, দলীয় শিখন ও অন্যান্য শিক্ষণ কৌশল, বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ উন্নয়ন, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব, শিক্ষকের উপস্থাপন ও যোগাযোগ দক্ষতা, শিক্ষায় মূল্যবোধ শিক্ষা ও জেন্ডার, উপকরণ উন্নয়ন ও এর বহুমুখী ব্যবহার এবং শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ও সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি।

অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আউয়াল খান, পরিচালক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রফেসর ড. সরকার আব্দুল মান্নান, সদস্য, কারিকুলাম-এনসিটিবি, প্রফেসর টি আই সরকার, সাবেক উপাধ্যক্ষ, রাজউক মডেল স্কুল ও কলেজ, প্রফেসর কল্যাণময় সরকার, ড. সাইফুল আলম, অধ্যাপক, তথ্য বিজ্ঞান ও লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মো. মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, বাউবি প্রমুখ প্রশিক্ষণ কোর্সে রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তপন কুমার দাশ উপ-পরিচালক, জামিল মোস্তাক, উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান কোর্স পরিচালনায় সহায়কের ভূমিকা পালন করেন।

এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পরিদর্শনের অংশ হিসেবে দেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সেন্ট জোসেফ স্কুল এন্ড কলেজ'-এর কার্যক্রম পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করবেন এমন কিছু কাজ চিহ্নিত করে বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর সামসুল হুদা, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মিজানুর রহমান আখন্দ

শিক্ষা বাজেট বিষয়ক মতবিনিময় সভা

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পিরোজপুর জেলায় পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি, পিরোজপুর ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ আয়োজনে শিক্ষা বাজেট বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এস এম সোহরাব হোসেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), পিরোজপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে মোঃ খন্দকার আলাউদ্দিন আল আজাদ জেলা শিক্ষা অফিসার, পিরোজপুর সহদেব চন্দ্র পাল, অধ্যক্ষ আফতাব উদ্দিন কলেজ, মিজানুর রহমান সহযোগী অধ্যাপক, পিরোজপুর সরকারী সোহরাওয়ার্দী কলেজ, এস এম আলমগীর,সহকারী সুপার, পিটিআই, আমিনুল ইসলাম, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার উপস্থিত ছিলেন। জনাব মোহসেনাতুন নেছা মাসুম সভাপতি, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি ও প্রধান শিক্ষক (অবঃ), পিরোজপুর সরকারী বালিকা বিদ্যালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সভায় প্রধান উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং জনাব আশিক ইকবাল উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব জিয়াউল আহসান নির্বাহী পরিচালক, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি।

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল:

- মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করতে হলে শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও শিক্ষায় বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে;
- মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলেও প্রকৃতপক্ষে বরাদ্দের হার প্রতি বছরই কমছে। কর্মমুখী শিক্ষা বাড়াতে হবে।;
- এমডিজি-র শিক্ষাবিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অনেকটাই অর্জিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের সংখ্যা, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব জায়গায় বাজেট বৃদ্ধি প্রয়োজন;

সভায় ভারপ্রাপ্ত মেয়র, পিরোজপুর পৌরসভা, বিভিন্ন কলেজ, বিদ্যালয় ও মাদ্রসার শিক্ষকবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ইমাম, অভিভাবক প্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার প্রধান ও প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি, অন্যান্য পেশাজীবী এবং স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিনিধি সহ মোট ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সামছুন নাহার বেগম কলি

একুশ আমার অহংকার

- যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী,
  সে জন কাহার জন্ম নির্ণয়ে ন জানি।
- বিনা স্বদেশী ভাষা
  মেটে কি আশা।
- মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা...
- বাংলা আমার প্রাণের আশা, মায়ের ভাষা ভাই,
  বাংলা ভাষার চাইতে খাসা বিশ্বে কোথাও নাই।
- আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
  আমি কি ভুলিতে পারি,
  ছেলে-হারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
  আমি কি ভুলিতে পারি,
  আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
  আমি কি ভুলিতে পারি।
- একুশ মানে ভাইয়ের রক্ত, মায়ের চোখের জল।
  একুশ মানে বাবার বুকে কষ্টের চাপা কল।
- ওরা আমার মুখের কথা কাইড়্যা নিতে চায়,
  ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে পায়।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৬১ ফাল্গুন ১৪২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংখ্যা

সম্পাদক

আবার এসেছে ফেব্রুয়ারি আমাদের সকলের হৃদয়ে আর মননে বাসন্তী বাতাসের আবহ তুলতে। সেই একটি অনাবিল অনন্য ঐতিহাসিক দিন বিগত কয়েক দশক ধরে আমাদের সারা একটা মাসের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজৈবিক রসদের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। যে ভাণ্ডার অবশ্যই চিরায়ত, অনিঃশেষভাবে ভাস্বর এবং অফুরান প্রেরণা যোগানোর শক্তি। ১৯৯৯ সাল থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের কল্যাণে ও ঘোষণায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে। তাতে অবশ্যই আমাদের গৌরব বেড়েছে, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি বাড়তি অনেকটা গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠেছে সারা বিশ্বে। কিন্তু আন্তর্জাতিকতার ওই বিস্তৃতি ও তাৎপর্যকে আলাদা করে দেখলেও অদ্যাবধি মনে হয়, এই যে একুশে ফেব্রুয়ারির দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা ও চেতনাগত অভিযোজনা আমাদের মানে বাঙালিদের বিশেষভাবে তাড়িত করে, আন্দোলিত করে, দূর স্মৃতিকাতরতায় ভাসিয়ে আবেগে মথিত করে, সেই অভিজ্ঞতা একান্তই আমাদের একান্ত ভুবনের। অনির্বচনীয়, অনিন্দ্য, সত্যিই অমর একুশে।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

কখনো কখনো অবশ্য এমন দুর্বল সংশয় মনের মধ্যে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত কেমন আঁকিবুঁকি সৃষ্টি করে। ওই যে সব বাঙালিচিত্ত স্নাত করা, পরিশুদ্ধ করা, অশ্রুসিক্ত শব্দমালা- 'আজ আমি কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' অথবা শামসুর রাহমানের অতুলন বয়ান দুঃখিনী বর্ণমালার অথবা শরীর শিউরে ওঠা লতিফ ভাইয়ের সেই গান, 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়্যা নিতে চাই' বা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহের কুমড়ো ফুলের চিত্রায়নের মাধ্যমে একুশে ফেব্রুয়ারির যে সমগ্র স্বদেশব্যাপী আবেদনের আস্বাদ বাঙালিকে বিহ্বল করেছে, সেই ভাবনার কোন অনুসরণ কি আজকাল শোনা যায়? দেশের প্রায় সর্বত্রই একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আলোচনা-সভা, আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে ইচ্ছে করে, তার কতটুকু শুধুই আনুষ্ঠানিকতা, নাকি আন্তরিক প্রয়াস আছে এইসব উদ্যোগে, যাতে মাতৃভাষা, এদেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শিশু-কিশোরদের, নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইতিবাচক উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়? এ বিষয়ে শিক্ষকবৃন্দ ও স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকাকে আরো সুচিহ্নিত ও গতিশীল করতে হবে।

অতি সাম্প্রতিক কালে আমাদের সমাজে অসহিষ্ণুতা ও কিশোর-অপরাধ বৃদ্ধির একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। তার প্রতিষেধক হিসেবে অনেক রকমের পদক্ষেপের কথাই আলোচিত হয়ে থাকে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি দেশের অনাদি, উদারবাদী ও সম্মিলনমূলক যে সাংস্কৃতিক ধারা ও চেতনার নির্দেশ করে, তার লালন ও চর্চা থেকে আমরা কতটা সরে এসেছি, তাও বিবেচ্য। আমরা নৈতিকতার সংকটের কথা বলি। সেকথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ভাষার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি তো আমাদের 'ফিরে চল মাটির টানে'-র আহ্বান জানায়।। মানুষের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সমতাবোধ এবং আত্মীয়তার বন্ধনও তো একুশের শিক্ষা।

একুশে আমাদের বলে দেয়, 'বিশ্বমানব হবি যদি শাশ্বত বাঙালি হ'।

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন: ৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org